ভবিষ্যতের বাঙালী

এস্. ওয়াজেদ আলি,

বি. এ. (কেণ্টাব), বার-এ্যাট্-ল

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক:

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ.

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস

৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

১ম মুদ্রণ—জানুয়ারী '৪৩

২য় মুদ্রণ—জানুয়ারী '৪৪

মূল্য দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীফণিভূষণ রায়

প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫২-৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ভবিষ্যতের বাঙালী

Approved by Calcutta University as Matric Rapid Reader Text for 1946, Vide Calcutta Gazette November 18, 1943

বিষয়-সূচী

ভবিষ্যতের বাঙালী	৫
রাষ্ট্রের রূপ	২১
রাষ্ট্র ও নাগরিক	৩৪
হিন্দু-মুসলমান	৪৪
ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য	৭৮
প্রেমের ধর্ম্ম	৮৭
জাতীয় জাগরণ	৯৮

ভবিষ্যতের বাঙালী

রাষ্ট্রের স্বভাব-ধর্ম্ম হ'চ্ছে নিজের আত্মরক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করা। আর সেই জন্য কোন একটা রাষ্ট্র একবার বাস্তব-রূপ ধারণ করলে, তার পরিচালকদের প্রথম চেষ্টা হয় দেশের আত্মরক্ষামূলক (militarily defensible frontiers) ব্যবস্থা করা। আত্মরক্ষার ক্ষমতা যদি রাষ্ট্রের না থাকে, তা' হ'লে সে প্রতিষ্ঠান এই স্বার্থপ্রধান জগতে স্থায়িত্ব-লাভের আশা করতে পারে না। বর্ত্তমান শতাব্দীর মহাযুদ্ধের ব্যাপারে এ সত্যের প্রমাণ আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করছি।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, সহজেই বোধগম্য হয় যে, আকারে বড় হ'লেও, এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে প্রকৃতি দেবী একটি অখণ্ড দেশ করেই সৃষ্টি করেছেন। আত্মরক্ষামূলক সীমান্তের কথা তুললেই, আমাদের দৃষ্টি পড়ে খাইবার গিরিবর্ত্মের দিকে, হিমালয়ের অভ্রভেদী প্রাকারশ্রেণীর দিকে, আসামের দুর্গম পার্ব্বত্যভূমির দিকে, আর দক্ষিণে অন্তহীন সমুদ্রের দিকে। এই সবই হ'ল প্রকৃতি-রচিত সেই আত্মরক্ষার কৌশল যাদের দরুণ ভারতবর্ষ এসিয়া মহাদেশের অন্যান্য অংশ থেকে স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। এদের সাহায্যেই ভবিষ্যতে

ভারতবাসী বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার সহজ এবং কার্য্যকরী ব্যবস্থা করতে পারে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাজ্য এবং প্রদেশগুলির মধ্যে প্রকৃতিরচিত সেরূপ কোন দুর্ভেদ্য ব্যবধান নাই। অবশ্য উত্তর-ভারত অথবা হিন্দুস্থান এবং দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ ত্রিকোণকে বিভক্ত ক'রে বিন্ধ্যাচলের পর্ব্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে; এবং সেই জন্যই ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান অংশের মধ্যে যাওয়া-আসা কতকটা কষ্টসাধ্য। তবে প্রকৃতি-রচিত এই প্রাকারশ্রেণীর মধ্যে অনেক ফাঁক এবং ফাটল র'য়ে গেছে; তাই রামচন্দ্রের যুগ থেকে ইংরেজদের আমল পর্য্যন্ত বিন্ধ্যাচলের প্রাকার কোন দিগ্বিজয়ীর পথ রোধ করতে কিম্বা তার অভিযান ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়নি। অনেকে বলতে পারেন, খাইবার-গিরিবর্ত্মও তো বৈদেশিক শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। আর্য্যদের সেই সুদূর যুগ থেকে আহম্মদ শাহ আবদালীর যুগ পর্য্যন্ত এই খাইবার-গিরিবর্ত্ম অতিক্রম ক'রেই বৈদেশিক শত্রু ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে; সে কথা অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নাই। তবে এ কথা অন্ততঃ আমরা সহজে বলতে পারি যে, ভারতবাসীর পক্ষে বৈদেশিক শত্রুকে খাইবার-গিরিবর্ত্মের মুখে ঠেকিয়ে রাখা ভারতের অন্য কোন স্থানে তার গতিরোধের চেয়ে অনেকখানি সহজসাধ্য কাজ। তারপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের লোকদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে সত্যই মনে হয়, প্রকৃতি দেবী যেন ভারত-রক্ষার সমস্যার কথা ভেবেই দেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সেই সব দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধকুশল জাতিকে স্থাপিত করেছেন-যাদের বাহুবল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এদেশের রক্ষাকবচ হ'য়ে আছে। সব দিক্ থেকে বিচার করলে, মনে এ-ধারণা অতি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে, আত্মরক্ষার প্রাকৃতিক কুশলতার দিক্ থেকে ভারতবর্ষ এক অখণ্ড দেশ। সুতরাং রাষ্ট্রের হিসাবে

ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড মহারাষ্ট্ররূপেই দেখতে এবং ভাবতে হ'বে। এক্ষেত্রে এ কথাও ভুললে চলবে না যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের যুদ্ধকুশল জাতিগুলিকে যদি দেশের প্রহরীরূপে গ্রহণ করা না হয়, তা' হ'লে বাহুবলের প্রভাবে তারা শেষে দেশের মালিকের স্থান অধিকার করবে।

তবে মানুষ যন্ত্র নয়। তার রাষ্ট্রজীবনের আলোচনায় কেবল দুর্ভেদ্য সীমান্ত আর তার যুদ্ধকুশলতার কথা ভাবলেই চলবে না। এই যে সীমান্ত-প্রহরীর কথা ভাবতে হয়, এ থেকেই বোঝা যায় যে, লোভ, লালসা, দ্বেষ, হিংসা, রাগ, বিরাগ প্রভৃতি বিভিন্ন রিপুর তাড়নাতেই মানুষের জীবন পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। তা'ছাড়া সামরিক বিশেষজ্ঞেরা যাই বলুন, রাষ্ট্রের সবচেয়ে মজবুত আত্মরক্ষার উপায় হ'ল রাষ্ট্রবাসীদের অন্তরের স্নেহ, প্রীতি এবং ভালবাসা। সাধারণ রাজনীতিকেরা এই মহাসত্যকে উপেক্ষা করেন বলেই রাষ্ট্রে অন্তর্বিপ্লব এসে দেখা দেয়, আর তার ফলে আত্মরক্ষার বিধি-ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, পরীক্ষার বেলায় রাষ্ট্র ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যায়।

সর্ব্বদেশের সর্ব্বমানব মিলে পরস্পরের প্রেম আর ভালবাসার ভিত্তিতে যদি এই পৃথিবীতে এক অখণ্ড রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারত, তা' হ'লে সেই হ'ত আমাদের আদর্শ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান! সে রাষ্ট্রে দ্বেষ-হিংসা, দ্বন্দ্ব-কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি অপ্রীতিকর জিনিষ কিছুতেই থাকত না। পরস্পরের মঙ্গল সাধনের জন্য, পরস্পরকে সাহায্যদানের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব থাকত; মানুষের সেবা করতে পারলে, মানুষ নিজেকে ধন্য মনে করত; বিশ্বময় বিরাজ করত সুখ আর শান্তি, প্রেম আর প্রীতি, সেবা আর কৃতজ্ঞতা। এই পৃথিবী তা'হ'লে স্বর্গ হ'য়ে যেত। কিন্তু তা' হয়নি! হ'বার কোন সম্ভাবনাও আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না! এর কারণ কি?

মানুষ অন্ধকার থেকে আলোয় আসবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু এখনও সে অন্ধকারেই আছে! সঙ্কীর্ণতার বাঁধ অতিক্রম করবার চেষ্টা সে করছে বটে, কিন্তু এখনও সঙ্কীর্ণতা তার অন্তরকে দৃঢ়ভাবে ঘিরে আছে! পরের ছেলেকে সে ভালবাসার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু নিজের ছেলেকেই সে বেশী ভালবাসে; বিদেশীর সঙ্গে, বিজাতীয়ের সঙ্গে সে সহানুভূতি দেখায় বটে, কিন্তু স্বদেশীদের প্রতি এবং স্বজাতীয়দের প্রতিই তার অন্তরের টান বেশী; সর্ব্বধর্ম্মের এবং সর্ব্বকৃষ্টির প্রতি সে উদারতা দেখাবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু নিজের কৃষ্টি এবং ধর্ম্মকেই সে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে। মানুষের মনের এই স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতা থেকেই বিভিন্ন দলের, সম্প্রদায়ের এবং গণ্ডীর সৃষ্টি হয়। আর তাই থেকে আসে যত দ্বন্দ্ব আর কলহ, যুদ্ধ আর বিগ্রহ, বিরোধ আর অশান্তি!

রাষ্ট্রের ভিত্তি হ'চ্ছে আত্মীয়তা। একই গোত্রের লোককে নিয়ে সুদূর কোন অতীত যুগে মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবন আরম্ভ হয়েছিল। গোত্রপ্রীতির প্রভাব এখনও প্রত্যেক রাষ্ট্রে গভীরভাবে অনুভূত হয়। তবে গোত্রীয় ঐক্য এখন আর রাষ্ট্রীয় জীবনে অপরিহার্য্য নয়। গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, সুইটজারল্যাণ্ড প্রভৃতি উন্নতিশীল রাষ্ট্রে কোনরূপ গোত্রীয় ঐক্য নাই। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মগত ঐক্যেরও প্রয়োজন দেখা যায় না। উপর্য্যুক্ত রাষ্ট্রগুলিতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। গোত্রীয় এবং ধর্ম্মৈক্যের স্থানে ঐ সব দেশে এখন অন্যবিধ ঐক্য এসে দেখা দিয়েছে। যথা—(১) কৃষ্টি-মূলক ঐক্য; (২) ভাষামূলক ঐক্য; (৩) স্বার্থমূলক ঐক্য; এবং (৪) আদর্শমূলক ঐক্য। প্রকৃত পক্ষে ব্যবহারিক ধর্ম্মের এবং গোত্র-মূলক আত্মীয়তার স্থান ঐ সব দেশে এখন এই শেষোক্ত বন্ধনগুলিই দখল করেছে। এই বন্ধনগুলির সঙ্গে ভৌগোলিক ঐক্যের বন্ধন জুড়ে

দিলেই একটা আধুনিক জাতির সৃষ্টি হয়। ভারতের জাতীয়তার সৌধকেও এই শ্রেণীর ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে। অবশ্য রাষ্ট্রগঠনের বেলায় সীমান্ত-রক্ষা-ব্যবস্থার কথাও মনে রাখা চাই।

রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে অনেক সময়ে ব্যর্থ হয়, প্রাচীন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান যে অনেক সময়ে অন্তর্বিপ্লববশতঃ আপনা থেকেই ভেঙ্গে পড়ে, তার কারণ কি? একটু অনুসন্ধান করলেই দেখতে পাই, ঐক্যের যে সূত্রগুলি আমরা উল্লেখ করেছি, তাদের সবগুলির কিম্বা কতকগুলির অভাব হয়েছিল বলেই সেরূপ ঘটেছে; ঐক্যের স্থানে তাই অনৈক্য এসে দেখা দিয়েছে, মৈত্রীর স্থানে দ্বন্দ্ব এসে দেখা দিয়েছে, সহযোগের স্থানে অসহযোগ এসে দেখা দিয়েছে, আর তার ফলে রাষ্ট্র-সৌধ ভেঙ্গে চূরমার হ'য়ে গিয়েছে।

প্রথম মহাসমরের পূর্ব্বেকার অষ্ট্রীয়ান-সাম্রাজ্য পৃথিবীর অন্যতম প্রবল প্রতাপশালী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান রূপেই গণ্য হ'ত। অথচ পরীক্ষার বেলায় সে সাম্রাজ্য টিকল না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হ'য়ে গেল। তুরস্ক-সাম্রাজ্যেরও সেই দশা ঘটল। সেই একই পরীক্ষায় জার্ম্মাণ রাষ্ট্র কিন্তু টিকে রইল। অষ্ট্রীয়ান এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যদ্বয়ের আভ্যন্তরীণ জীবনে সেই কৃষ্টিগত, ভাষাগত, স্বার্থগত এবং আদর্শগত ঐক্য ছিল না, যা' সঙ্কটের সময়ে তাদের বাঁচাতে পারত! জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যে সে ঐক্য প্রভূত পরিমাণেই ছিল। জার্ম্মাণী তাই টিকে থাকল।

আমাদের দেশের ইতিহাস খুললে দেখতে পাই, অখণ্ড ভারতীয় সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কেন্দ্রীয় শক্তির বাহুবলের প্রাচুর্য্যের উপরেই নির্ভর করেছে, জাতির অন্তরের ঐক্যের উপরে নির্ভর করেনি। কেন্দ্রীয় শক্তিতে যখনই বাহুবলের অভাব ঘটেছে, অন্তরের ঐক্যের অভাবে দেশ তখনই বিভিন্ন খণ্ড-রাষ্ট্রে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে। যে অন্তরের ঐক্যের উপরে একটি রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে, সে ঐক্য অখণ্ড

ভারতবর্ষে কখনও দেখা দেয়নি। আর তাই কেন্দ্রীয় শক্তি যখনই দুর্ব্বল হয়েছে, স্বাভাবিক ঐক্যের উপর নির্ভর ক'রে বিভিন্ন খণ্ড রাষ্ট্রগুলি তখনই মাথা তুলেছে।

ভারতবর্ষে স্থায়ী রাষ্ট্রসংগঠন করতে হ'লে দু'টি জিনিষের দিকে লক্ষ্য রাখা, আর রাষ্ট্রজীবনে তাদের উভয়বিধ প্রয়োজন পরিপূরণের সুব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। চতুঃসীমানার প্রাকৃতিক সীমান্তের দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত ভারতবর্ষে এক সম্মিলিত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান গঠন করা দরকার; এবং অন্তরের স্বাভাবিক সহানুভূতির দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষ্টিগত (কাল্‌চার), ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তির উপর দেশে বিভিন্ন খণ্ড রাষ্ট্রের বা উপরাষ্ট্রের সৃষ্টি করা দরকার। এই ভাবে অগ্রসর হ'লে, ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে আমরা সাম্রাজ্যের শক্তি, আর জাতির জীবনের সুখ-শান্তি, নৈতিক বল এবং আত্মিক প্রেরণা— উভয়বিধ সুবিধাই লাভ করতে পারব। একের মধ্যে বহুত্ব, আর বহুর মধ্যে একত্ব—এই উভয়বিধ মঙ্গলের সমাবেশে আমাদের জাতীয় জীবন অভিনব ঐশ্বর্য্য লাভ করবে।

দেশপ্রেম আমাদের যতই উগ্র হ'ক না কেন, বাস্তবতাকে ভুলে রাষ্ট্র গড়তে গেলে আমরা মারাত্মক ভুল করব। কেন না, একমাত্র বাস্তবতাই হ'ল আদর্শ-সৌধের প্রকৃত ভিত্তি। সেই বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, সহজেই আমরা বুঝতে পারব, সমস্ত ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস শেষ পর্য্যন্ত অসন্তোষ এবং ব্যর্থতা এনে দেবে। কেন না, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ভাষার ঐক্য নাই, কৃষ্টির ঐক্য নাই, স্বার্থের ঐক্য নাই, ধর্ম্ম এবং গোষ্ঠীর ঐক্যও নাই। এরূপ ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে একটা বাহ্য একতানয়নের প্রয়াসে সমাজের অন্তর্নিহিত অনৈক্য আরও স্পষ্টতর

হ'য়ে ওঠাই স্বাভাবিক; আর হ'চ্ছেও তাই। দৈনন্দিন রাজনীতির প্রয়োজনের তাগিদে জোর ক'রে ঐক্যের অনুভূতি আনা যায় না। তার জন্য দরকার অন্তরের ভালবাসা, অন্তরের সহানুভূতি, অন্তরের আকর্ষণ—আর দরকার স্বার্থ এবং আদর্শের ঐক্যানুভূতি।

তবে নিরাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। অতীত ইতিহাসের আলোচনা করলে দেখতে পাব—দুর্দ্দিনে ভারতবর্ষ মোটামুটিভাবে এবং সাধারণতঃ এমন কতকগুলি খণ্ড রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল, যাদের প্রত্যেকের মধ্যে জাতীয় (national) জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি প্রত্যক্ষভাবে অথবা সুপ্তাবস্থায় বিরাজ করেছে। "মোটামুটিভাবে" এবং "সাধারণতঃ" বলার তাৎপর্য্য এই যে, রাষ্ট্রের ইতিহাসে কোন জিনিষই ঠিক যৌক্তিকতার নিক্তির উপর নির্ভর ক'রে বণ্টিত বা নিরূপিত হয় না। তবে বিভিন্ন প্রভাবের, বিভিন্ন গতির একটা মোটামুটি ফল জাতির জীবনের খাতায় তার অঙ্ক ক'ষে যায়।

ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টি-কেন্দ্র থেকে বিচার করলে, ভারতবর্ষে স্বাভাবিক কয়েকটি ভৌগোলিক বিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। যথা—বঙ্গদেশ, হিন্দুস্থান, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থান, সিন্ধুদেশ, মহারাষ্ট্রদেশ ইত্যাদি। এই সব ভূখণ্ডের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব কৃষ্টি, নিজস্ব ইতিহাস, নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, নিজস্ব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা আছে। এই ভূখণ্ডগুলির নিজ নিজ বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য করলে, এদের প্রদেশ না ব'লে এক একটি রাষ্ট্র বা উপরাষ্ট্র বললেই সঙ্গত হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বিভিন্ন উপরাষ্ট্রগুলির বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণশীল এক একটি রাজ্যের (Dominion) অধিকার দেওয়া দরকার—অবশ্য তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহের সম্পর্কে!

আর ভারত-রক্ষার জন্য এবং বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি চালনার জন্য একটী কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের সৃষ্টি করা দরকার। এই পথে গেলেই আমরা ভারতবর্ষে স্থায়ী এবং বর্ত্তমান জীবনের প্রয়োজনের উপযোগী রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রবর্ত্তন করতে পারব। ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনের গতিপ্রকৃতি ও ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ আমাদের সেই নির্দ্দেশই দিয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষ যে কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত হ'য়ে গেছে, তার মধ্যে আমাদের বাংলা দেশ অন্যতম। বাংলা দেশের কি কি বিশেষত্ব আছে, যে-জন্য ভারতের অন্যান্য দেশ থেকে সে স্বতন্ত্র এক আকার ধারণ করেছে, এখন তারই আলোচনা করা যাক।

প্রথম যে বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে— সেটি হ'চ্ছে ভাষা-গত ঐক্য। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলে একই ভাষা ব্যবহার করে; আর সেটি হ'চ্ছে বাংলা ভাষা। দ্বিতীয়তঃ, এদেশের বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকের মধ্যে মোটামুটিভাবে এমন একটা কুলগত ঐক্য আছে, যে জন্য কে কোন্ ধর্ম্মের লোক, সহজে তা' চেনা যায় না; পক্ষান্তরে যে-কোন বাঙালীকে যে-কোন অবাঙালী থেকে সহজেই পৃথক ক'রে লওয়া যায়। দ্রাবিড়, আর্য্য, মোঙ্গল, সেমিটীক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির শত শত বৎসরের সংমিশ্রণের ফলে অভিনব অথচ সুনির্দ্দিষ্ট এক জাতির উদ্ভব হয়েছে, যাকে আধুনিক বাঙালী জাতি বলা যেতে পারে। আর সেই বাঙালী জাতির এমন কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, যে-জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক থেকে সহজেই তাদের পৃথক্ ক'রে নেওয়া যেতে পারে। যথা—বাঙালী শান্তিপ্রিয়; যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি সে ভালবাসে না। বাঙালী বুদ্ধিমান্, ভাবপ্রবণ—সঙ্গীত, সাহিত্য, কলাবিদ্যা প্রভৃতিকে

অন্তরের সঙ্গে সে ভালবাসে; ধর্ম্মের বিষয়ে সে উদার মত পোষণ করে; গোঁড়ামি সে মোটেই পছন্দ করে না। বিদেশের আমদানী করা কৃত্রিম উত্তেজনা কখনও কখনও বাঙালীর মনে ধর্ম্মের গোঁড়ামির সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সে মনোভাব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কেন না, ধর্ম্ম বিষয়ে সঙ্কীর্ণতা বাঙালীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। নূতনের প্রতি একটা স্বাভাবিক ভালবাসা বাঙালী তার অন্তরে পোষণ করে। নূতন ভাব, নূতন প্রথা, নূতন আদর্শকে নূতন বলেই সে বর্জ্জন করে না; পক্ষান্তরে যাচাই ক'রে নূতনের মূল্য নিরূপণ করতে চায়। কায়িক পরিশ্রমের চেয়ে ভাবের চর্চ্চাই বাঙালীর বেশী প্রিয়। সুযোগ এবং সুবিধা পেলেই সে কাজকর্ম্ম ছেড়ে ভাবের চর্চ্চায় বিভোর হ'য়ে যায়। নাগরিক জীবনের চেয়ে বাঙালী পল্লীজীবন ও স্বভাব-সৌন্দর্য্যকে বেশী পছন্দ করে। বাংলার ইতিহাস ধর্ম্মের উৎকট দ্বন্দ্বে কলঙ্কিত নয়। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সহজে এবং স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি বাস করে। আর গত হাজার বৎসরের ইতিহাস তাদের মধ্যে এক নিবিড় আত্মীয়তা এবং ঐক্য স্থাপন করেছে। তাদের এক জাতি বলতে এখন আর দ্বিধাবোধ হয় না। বাঙালী জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সমস্যা এক। আর বাঙালীর অর্থ-নৈতিক স্বার্থ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে ভিন্ন। প্রকৃতি দেবীই স্বার্থের এই বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন। হিন্দু এবং মুসলমান—এই দুই প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি এদেশে প্রায় সমান-সমান। তাই এক সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায়ের প্রভুত্বের সমস্যা প্রকৃতপক্ষে এদেশে ওঠে না। তারপর ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে দীর্ঘ এবং ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে বাংলা দেশে এমন এক কৃষ্টি এসে দেখা দিয়েছে, যার দৃষ্টি স্বভাবতঃই ভবিষ্যতের

দিকে এবং বিশ্বমানবতার দিকে। পশ্চামুখী সাম্প্রদায়িক কৃষ্টি সব ক্ষেত্রেই পিছে হ'টে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক ভাব (Democratic spirit) ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশে অনেক বেশী গভীর এবং ব্যাপক। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীই গণতান্ত্রিকতা এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান এবং বিশ্বস্ত সমর্থক।

(আমাদের মনে হয়, প্রকৃতি দেবী—নিত্য নূতনের সৃষ্টিতেই যাঁর প্রধান আনন্দ—ভারতের এই পূর্ব্ব ভূখণ্ডে নূতন এক জাতির, নূতন এক সভ্যতার, নূতন এক জীবনধারার, নূতন এক কৃষ্টির, নূতন এক আদর্শের সৃষ্টিপ্রয়াসে নিরত আছেন। অতীতের বিভিন্ন উপকরণের অভিনব সংযোগে বাঙালীর জীবন নিয়ে তিনি এক নূতন শিল্প-নিদর্শনের সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। যাদের সাহায্যে তিনি এই নূতন রূপ-রচনায় রত আছেন, সে জাতি এখনও তার ভবিষ্যৎ গৌরবের বিষয়ে অবহিত হয়নি বটে, তবুও মানুষ যেমন ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের আভাস তার অবচেতনায় পেয়ে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে, অথচ সে-উল্লাসের কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারে না—এই বাঙালী জাতিও তেমনি ভবিষ্যৎ গৌরবের অস্পষ্ট ইঙ্গিত তার অবচেতনায় পেয়ে এক অব্যক্ত আনন্দানুভূতি অনুভব করছে, নূতন কিছুর জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠছে, অভিনব কিছুর সন্ধানে দিশাহারা হ'য়ে ফিরছে; অথচ কেন যে এমন হ'চ্ছে, তা' ঠিক তারা বুঝতে পারছে না। আর তাই মামুলী ধরণের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে বাঙালী সন্তুষ্ট হ'তে পারছে না; মামুলী ধরণের রাজনীতিক এবং সমাজনীতিকেরা তার অন্তর যেন স্পর্শ করতে পারছে না। স্পষ্টভাবে উপলব্ধি না ক'রেও, বাঙালী ভবিষ্যতের পূর্ণতর রাজনীতির জন্য প্রতীক্ষা করছে—একটা সম্পূর্ণ কৃষ্টির জন্য, একটা পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের ও পূর্ণতম

বিকাশের জন্য যেন বাঙালী প্রতীক্ষা করছে। রাষ্ট্রজীবনের যে পরিকল্পনা, সামবায়িক জীবনের যে ছবি বাংলাদেশের বাইরের ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করে, এই ভাবপ্রবণ কল্পনাকুশল জাতি সে-আদর্শ, সে-ছবি, সে-পরিকল্পনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না। তার কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন নিগূঢ় অবচেতনায় মহামানবের মহত্তর এক আদর্শ, পূর্ণতর এক পরিকল্পনা, সুন্দরতর এক ছবি আকার এবং রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে সেই মহনীয় আদর্শ, সেই পরিপূর্ণ পরিকল্পনা, সেই অপরূপ ছবি তার মনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠবেই, আর তার প্রভাবে বাঙালী এক অভিনব জীবনের আস্বাদ পাবে: এবং সেই শুভদিন যখন আসবে, তখন বাঙালী কেবল ভারতবর্ষের নয়, কেবল প্রাচ্য ভূখণ্ডের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর পথপ্রদর্শক হ'বে—সত্য, সুন্দর, শুভ জীবন-পথের। বাঙালী এখন সেই মহামানবের প্রতীক্ষায় আছে, যিনি তাকে এই গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবেন—ভগীরথের মত এই বাংলায় ভাবগঙ্গার সঙ্গম সুস্পষ্ট ক'রে তুলবেন।

আরবের কবি বলেছেন, "কবিরা হচ্ছেন অদৃশ্য মহাশক্তির ভাষ্যকার।" অতি সত্য—অতি মূল্যবান্ কথা। বাংলার গৌরবময় ভবিষ্যৎ—মন্ত্রীরা কিম্বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা, কিম্বা রাজনীতিকেরা গঠন করবেন না; সে কাজ করবেন—দেশের সত্যকার কবি, মনীষী ও সাহিত্যিকরা। যে অদৃশ্য মহাশক্তি মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছেন, তিনি ব্যবসাদারী রাজনীতিকের স্থূল অনুভূতিতে তাঁর সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ মনের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশ করেন না; তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ভাবুকের উদার মনে, তার বেদনা-করুণ প্রাণে, তার সুদূর-প্রসারিণী প্রজ্ঞার জগতে! বাংলার কবিদের, বাংলার সাহিত্যিকদের বর্ত্তমানের সীমাবদ্ধ স্বার্থ-ঝটিকার ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ, সাম্প্রদায়িকতার হিংসা-বিদ্বেষ, হীনতা

এবং সঙ্কীর্ণতার বিষবাষ্পে ভারাক্রান্ত বর্ত্তমানকে ছেড়ে, কল্পনার বিমানে চড়ে' ভবিষ্যতের মনোরম উদ্যানে চ'লে যেতে হ'বে—জাতির গৌরবোজ্জ্বল অনাগত জীবন দেখবার জন্য; আর প্রতিভার তুলিকায় তার ছবি বর্ত্তমানের নৈরাশ্যক্লিষ্ট বাঙালীর জন্য আঁকবার উদ্দেশ্যে; এবং আশায় উদ্দীপ্ত সাহিত্যের, সঙ্গীতের ও শিল্পের সাহায্যে সেই গৌরবময় অনাগত যুগে অভিযানের জন্য তাকে অনুপ্রাণিত করতে! আমাদের কবিদের, আমাদের সাহিত্যিকদের, আমাদের শিল্পীদের, আমাদের ভাববাদীদের, আমাদের আদর্শবাদীদের সত্যই এখন ভবিষ্য-বাদী (Futurist) হ'তে হ'বে; কিম্ভূত-কিমাকার কোন পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার জন্য নয়, জাতিকে অমরাবতীর দ্বারে পৌছে দেবার জন্য, সেই অমরাবতীর কথা তাদের শোনাবার জন্য, আর সেই অমরাবতীর স্বপ্ন তাদের মনে জাগিয়ে তোলবার জন্য!

আমি এক শতাব্দী পরবর্ত্তী যে বঙ্গদেশের স্বপ্ন দেখি, তা' বর্ত্তমানের ধূলি-ধূসরিত, বন-জঙ্গল-আগাছা-সমাকীর্ণ, শ্রীহীন, সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট ঘর-বাড়ীতে ভরা, হৃতগৌরব নদনদীর খাতের দাগে কলঙ্কিত বঙ্গদেশ নয়। আমি শতাব্দী-পরের যে বাঙালী জাতির স্বপ্ন দেখি—সে বর্ত্তমানের ক্ষীণকায়, মাংসপেশীহীন, রোগ-বিশীর্ণ, অনশন-ক্লিষ্ট, গতশ্রী, আনন্দহীন, প্রেরণাহীন, কলহপ্রিয় বাঙ্গালী জাতি নয়! আমি যে বঙ্গনারীর ছবি দেখি, সে বর্ত্তমানের ভারাতুর, লজ্জা-কাতর, স্বাস্থ্যহীন, শ্রীহীন সৌষ্ঠবহীন, খর্ব্বাকৃতি শীর্ণকায় বাঙালী নারী নয়! আমি যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখি, তাতে কেরাণী-সৃষ্টির আগ্রহ নাই; গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়া মুসলমান-সৃজনের উৎকট প্রয়াসও নাই; অতীতের প্রাণহীন দেহগুলি সাজিয়ে রাখবার যাদুঘর সে প্রতিষ্ঠান নয়! আমি ভবিষ্যতের যে রাজনীতির স্বপ্ন দেখি, তাতে চাকুরীর ভাগ-বাটোয়ারার

কলহ নাই; স্বার্থ-সর্ব্বস্ব, কুচক্রী, ভণ্ড তপস্বীদের অভিনন্দনেরও ব্যবস্থা নাই! আমি ভবিষ্যতের যে সাহিত্যের কল্পনা করি, সে সাহিত্য শুধু অতীতকে নিয়ে কুহক রচনা নয়, নিজেদের তুচ্ছতাকে ঢাকবার জন্য কাল্পনিক অতীতের অশোভন অতিরঞ্জন নয়! আমি যে নাগরিকের কল্পনা করি, তার জীবন সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নয়, তুচ্ছতার যূপকাষ্ঠে বৃহত্তর স্বার্থের অমর স্বত্বাধিকারীকে বলিদানের জন্য নয়! আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর জীবনাদর্শের, সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর সাধনার, সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর কামনার সুখস্বপ্ন দেখি। আমার সে স্বপ্ন কি, এখন তাই বলি।

আমি যে ভবিষ্যৎ বঙ্গদেশের কল্পনা করি, তাতে বর্ত্তমানের মজা-নদীর এবং শুষ্ক খালের খাতে প্রচুর জলপ্রবাহের অশ্রান্ত কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে! তাদের বক্ষের ক্ষীরধারায় সমস্ত দেশ ফলে-ফুলে-শস্যে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছে! আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তাতে বাংলার প্রত্যেক পল্লীতে এবং প্রত্যেক জনপদে তার নিজস্ব নদী অথবা খাল আছে, যাদের সাহায্যে উদ্বৃত্ত বর্ষার জল অবাধে সাগর-পথে প্রবাহিত হ'চ্ছে; বর্ত্তমানের মত সে জল ম্যালেরিয়ার মশার সূতিকাগারের সৃষ্টি করছে না। আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তাতে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী গৃহশিল্পের আলিপনার সুন্দর এক একটি নিদর্শন হ'য়ে বিরাজ করছে। বর্ত্তমানের মত গৃহ-সৌন্দর্য্য-পিপাসুর মনে নিত্য সে নূতন যন্ত্রণার কারণ হ'চ্ছে না! আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তাতে প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব বাগান, নিজস্ব খেলার মাঠ, নিজস্ব পাঠাগার, নিজস্ব ক্লাব বা ইন্‌ষ্টিটিউট আছে। আর গ্রামবাসীরা সেই সব প্রতিষ্ঠানে পরস্পর সহযোগিতায় নিত্য নূতন আনন্দের সন্ধান পাচ্ছে। আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তাতে প্রশস্ত সুগঠিত রাজপথ দেশের প্রত্যেকটি গ্রামের সঙ্গে প্রত্যেকটি গ্রামকে, প্রত্যেকটি নগরের সঙ্গে প্রত্যেকটি

নগরকে সুসংলগ্ন রেখেছে! আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তাতে বাংলার গৃহপালিত পশুপক্ষীর শ্রী এবং সৌন্দর্য্য বাংলার গৌরবের বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তার মাংসপেশী-বহুল, সুঠাম, বলিষ্ঠ দেহ বাঙালী বৈদেশিকের বিস্ময় উৎপাদন করছে। আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তাতে বাঙ্গালী নারীর স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য বিশ্ববাসীর প্রশংসার বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! আমি যে ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তার বিদ্যানিকেতনগুলির স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য, তাদের উদ্যানের শোভা, তাদের বেষ্টনীর মনোহারিত্ব মানুষের মনকে সৌন্দর্য্যের অপরূপ জগতের সন্ধান দিচ্ছে! আর সেই সব প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য এবং ছাত্রদের পরস্পরের স্নেহ এবং প্রীতি নাগরিকদের আদর্শ হ'য়ে উঠেছে; তাদের সত্য-শ্রেয়ঃ-সুন্দরের সাধনা বিশ্বের অনুকরণীয় গৌরবের বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছি, তাতে হিন্দু তার ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত চির-সত্যের সন্ধান পেয়েছে, মুসলমান তার ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত শাশ্বত-সত্যের সন্ধান পেয়েছে; আর উভয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছে যে, যেখানে সত্য সেখানে দ্বন্দ্ব নাই; যেখানে সুন্দর সেখানে দ্বেষ-হিংসা নাই; যেখানে শ্রেয়ঃ সেখানে সঙ্কীর্ণতা নাই, কার্পণ্য নাই; আলোকের পথে অন্তহীন একাগ্র অভিযানই সকলের ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! আমি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, তাতে জ্ঞানসমৃদ্ধ, ভাবসম্পদে গরীয়ান্ বাঙালী রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, দেশ-শাসনের ভার, নেতৃত্বের অধিকার উত্তম-বুদ্ধিবিশিষ্ট যোগ্যতমের উপর অতি সহজভাবেই ন্যস্ত করছে—নির্ব্বাচনের অপ্রিয়তা ও স্বার্থান্ধতা সেখানে মুছে গেছে। আমি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, তার সাহিত্য থেকে শব্দের ফাঁকা আড়ম্বর আর ভাবের দৈন্য চিরতরে বিদায় গ্রহণ করেছে! সত্য-শ্রেয়ঃ-সুন্দরের নিত্য নূতন অনুভূতিতে সে সাহিত্য নিত্য নূতন পথ রচনা করছে। সে সাহিত্যের

দৃষ্টি সম্ভাবনাহীন অতীতের দিকে নয়; তার দৃষ্টি সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে। সে সাহিত্য কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়; সে সাহিত্য মানুষের জন্য, বিশ্বমানবের জন্য, চিরন্তন মানবতার জন্য! সে সাহিত্য দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে অদৃশ্য জগতের, রূপের সঙ্গে অরূপের, দেহের সঙ্গে আত্মার নিত্য নূতন মিলনসঙ্কেতে ভরপূর! আমি যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, তার নাগরিক হ'চ্ছে মানবতার আদর্শের অনিন্দ্যসুন্দর এক প্রতীক! বলিষ্ঠ দেহ; অটুট স্বাস্থ্য; জ্ঞানসমৃদ্ধ; ভাবে গরীয়ান্ আর ত্যাগে মহীয়ান্; প্রেমে ও দাক্ষিণ্যে সকলের আপন জন; সদা মঙ্গল-সাধনে রত; উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় বর্ত্তমানকে রূপায়িত করবার জন্য সদাই ব্যস্ত এবং তৎপর! আমার মনে হয়, এই গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্নই হ'ল বাঙালীর দেখবার মত স্বপ্ন; এই গৌরবময় ভবিষ্যতের চিন্তাই হ'ল বাঙালীর মনের উপযুক্ত চিন্তা; আর এই গৌরবময় ভবিষ্যতের জন্য সাধনাই হ'ল বাঙালীর শক্তির উপযুক্ত সাধনা!

এ স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে হ'লে, এ চিন্তাকে রূপায়িত করতে হ'লে, এ সাধনাকে সার্থক করতে হ'লে তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। যথা—(১) হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য; (২) বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য; আর (৩) শুভ বুদ্ধি ও জ্ঞানের উদ্বোধন এবং সম্প্রসারণ।

আমার মনে হয়, এই শেষোক্ত প্রয়োজনটির পূরণের উপরেই অপর দু'টির সাফল্য নির্ভর করছে। যাঁরা বাংলার এবং বাঙালীর সত্যকার মঙ্গলকামী, তাঁদের চিন্তা এবং সাধনাকে এই জ্ঞানের উদ্বোধন এবং সম্প্রসারণের কাজেই নিয়োজিত করতে হ'বে।

আরবজাতির জাতীয়তাবাদ (Arab Nationalism) আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এ জিনিষটি কারও কল্পনাতে ছিল না। আরবজাতি ধর্ম্মে

সাধারণতঃ মুসলমান। অথচ আরব-জাতীয়তার গোড়াপত্তন করেছেন আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত দু'জন খৃষ্টান মনীষী—নাজীফ এজীদী এবং বেতেরাস্ বোস্তানী। ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী দেশবাসীদের মধ্যে এই দুই মনস্বী জাতীয়তার আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা' প্রত্যেক দেশের দেশপ্রেমিকের অনুকরণীয়।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আরবজাতি যখন নৃশংসভাবে খৃষ্টান হত্যায় উন্মত্ত হ'য়ে উঠল, তখন সে হিংসানল-নির্ব্বাপনের উদ্দেশ্যে বোস্তানি বাইরুটে এসে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন। খৃষ্টানদের প্রতি আরব-জাতির সম্প্রীতি-সাধন করতে গিয়ে বোস্তানি উপলব্ধি করলেন, মূঢ়তা ঘুচাতে না পারলে মানুষের গোঁড়ামি ঘুচবে না, এবং গোঁড়ামি না ঘুচালে মানুষের মন দ্বেষ-হিংসার কণ্টকে পরিপূর্ণ থাকবেই। আরবে তিনি শিক্ষা-প্রসারের ব্যবস্থা করলেন। সে শিক্ষা-নিকেতন হ'ল জাতীয় বিদ্যালয়। আরব-প্রেমকে কেন্দ্র ক'রে, ধর্ম্ম-বিদ্বেষ ত্যাগ ক'রে এখানে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হ'ল। এ বিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষকতার জন্য বোস্তানি পেলেন নাজীফ এজীদীকে। নিঃস্বার্থ-প্রেমিক বোস্তানির আদর্শে এজীদী শ্রদ্ধান্বিত হলেন, এবং উভয়ের বিপুল সাধনায় আরবজাতি ক্ষুদ্রতা ভুলে, হিংসা-দ্বেষ ভুলে সর্ব্ব ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখল—আরবে আবার নূতন আরবের অভ্যুত্থান হ'ল।

নবীন আরবী অথবা নব্য তুর্কীর মত প্রকৃতির লীলা-নিকেতন এই সৌভাগ্য-সম্পদশালিনী বাংলা দেশে, এই বাঙালীর জীবনেই বা অখণ্ড এক আদর্শ জাতীয়তা সম্ভব হ'বে না কেন? এ সম্ভাব্যের প্রচুর উপকরণ বাঙালীর প্রকৃতিতে এবং বাংলার আকাশে-বাতাসে, নদী-নালায়, পথে-প্রান্তরে ও শ্যামলিমায় বর্ত্তমান। শুভবুদ্ধি নিয়ে বাঙালী শুধু নিঃস্বার্থ নয়ন মেলে দেখলেই হয়।

রাষ্ট্রের রূপ

মানুষ কেবল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে থাকতে পারে না। সামাজিক স্বার্থের আকর্ষণও সে অনুভব করে। নিজের স্বার্থের এবং সামাজিক স্বার্থের কথা ভাবা তার পক্ষে স্বাভাবিক। স্বার্থপরতা আর পরার্থপরতা—এ দু'টিই মানুষের প্রকৃতিগত। আর একে ভিত্তি ক'রেই তার সমাজজীবন গঠিত হয়েছে, তার নীতিবাদ রচিত হয়েছে।

তবে এ কথা সত্য যে, কোন কোন মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় আকারে, কারও মধ্যে বা সামাজিক স্বার্থ বড় আকারে দেখা দেয়। যাদের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থের মূল্য বেশী, তারা ধনী হয়, বিষয় সম্পত্তি করে, নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যাদের কাছে সামাজিক স্বার্থের মূল্য বেশী, তারা দেশপ্রেমিক হয়, দেশের মঙ্গলের জন্য সাধনা করে, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সেবায়, বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে।

বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষের উপরেই সমাজের মঙ্গল এবং উন্নতি নির্ভর করে। তাদের উৎসাহ এবং কর্মতৎপরতাই সমাজকে জীবনের উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায়, আর তাদের অবসাদ ও নিরুৎসাহ সমাজের পতন এবং মৃত্যুর কারণ হয়।

মানুষে আর পশুতে তফাৎ এই যে, মানুষের জীবন চিন্তার দ্বারা এবং পশুর জীবন দৈহিক প্রয়োজনের তাড়নায় পরিচালিত হয়। মানুষ যত উচ্চে উঠতে থাকে—চিন্তার, ভাবের (idea) প্রভাব তার জীবনে তত বাড়তে থাকে। সভ্যতার বিকাশ এবং বিস্তারের মানেই হ'চ্ছে চিত্তের বিকাশ, ভাবের (idea) সম্প্রসারণ।

প্রত্যেক যুগেই মানুষ সামাজিক জীবনের একটা না একটা আদর্শ, একটা না একটা পরিকল্পনা নিয়ে তার বেষ্টনীর সম্মুখীন হয়েছে। মানুষের প্রকৃত ইতিহাস হ'ল তার মনের ইতিহাস; তার বিভিন্ন আদর্শের, তার বিভিন্ন পরিকল্পনার উৎপত্তি, বিকাশ এবং লয়ের ইতিহাস; এবং তার বিভিন্ন আদর্শ এবং পরিকল্পনার, দ্বন্দ্বের, মিলনের ও সংমিশ্রণের ইতিহাস। এই যে দ্বন্দ্ব, সংমিশ্রণ আর মিলন—এ অবিরামভাবে চলেছে আর চিরকালই চলবে। এই দ্বন্দ্বে, এই সংগ্রামে সেই ভাব (idea), সেই পরিকল্পনাই জয়ী হয়—যা' দেশ, কাল এবং পাত্রের উপযোগী। যে ধারণা বা পরিকল্পনায় এ উপযোগিতার অভাব ঘটে, সেটি শেষে পরাভূত হয়; এবং সমাজদেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয়; না হয়, সমাজদেহে অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থান অধিকার ক'রে পড়ে' থাকে। মানবেতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এইরূপে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন পরিকল্পনা এসেছে, দু'দিনের জন্য নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছে, তারপর হয় মঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়েছে, না হয় নায়কের ভূমিকা ছেড়ে কোন ক্ষুদ্রতর ভূমিকা নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

এমন এক যুগ ছিল, গোষ্ঠীর আদর্শকেই (clanship) মানুষ যখন সব চেয়ে স্বাভাবিক, সব চেয়ে জীবন্ত প্রাণবন্ত সামাজিক আদর্শ ব'লে মনে করত। তখন গোষ্ঠীর ভিত্তির উপর রাজ্য ও সাম্রাজ্য গড়ে' উঠত, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হ'ত, সব কিছুই স্থাপিত হ'ত। এই

গোষ্ঠীর আদর্শেই সাইরাসের (Cyrus) সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, চেঙ্গিজ খাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এই গোষ্ঠীর আদর্শেই রাজপুত, পাঠান প্রভৃতি জাতির রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে' উঠেছিল। এই গোষ্ঠীর আদর্শেই ভারতীয় আর্য্যদের এবং ইহুদিদের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। এখনও ভারতবর্ষের সামাজিক জীবন এই গোষ্ঠীর ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু কার্য্যকরী জীবন্ত প্রাণবন্ত আদর্শ হিসাবে গোষ্ঠীমূলক পরিকল্পনা এখন সভ্যজগৎ থেকে এক রকম লোপ পেয়েছে। গোষ্ঠী অতীতের জিনিষ; বর্ত্তমানে তার জীবন মরণাপন্ন, ভবিষ্যৎ তার নাই বললেও চলে।

গোষ্ঠীর পর (অবশ্য বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে) নাগরিক রাষ্ট্রীয় ধারণার প্রভাব দেখতে পাই। বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক মিলে নগর-রচনা করল; তারপর নাগরিক রাষ্ট্রের জীবন আরম্ভ হ'ল। নাগরিক জীবন থেকেই এক রকম উচ্চতর সভ্যতার সূচনা হ'ল। ইউরোপীয় ভাষায় সভ্যতার সংজ্ঞামূলক শব্দই হ'চ্ছে নাগরিক জীবন (civilisation)। এই নাগরিক পরিকল্পনার ভিত্তির উপর বড় বড় সাম্রাজ্য, বড় বড় সভ্যতা গঠিত হয়েছে। রোম, এথেন্স, কার্থেজ প্রভৃতির নাম কে না জানে? কিন্তু কালের দুর্ব্বার প্রবাহ সবই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নাগরিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা এখন আর জীবন্ত কার্য্যকরী আদর্শ নয়; অতীতের সেই জীবন্ত আদর্শের স্মারকরূপে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রয়ে গেছে বড় বড় সহরের কর্পোরেশন, নাগরিক পরিষৎ প্রভৃতি, এই পর্য্যন্ত।

নাগরিক সভ্যতার লয়প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মরাষ্ট্রের আবির্ভাব দেখতে পাই। ইউরোপে পোপ আর সম্রাট্ এসে দেখা দিলেন। প্রাচ্যে দেখা দিলেন খলিফা। ধর্ম্ম-রাষ্ট্রের গৌরবের যুগও বিশ্বসভ্যতার

এক স্মরণীয় যুগ। খলিফা হারুণার রশিদ আর সম্রাট্ শার্লিমেনের (Charlemagne) কথা কে না শুনেছেন ?

মধ্যযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা অভিনব ভাবে ইউরোপে এসে দেখা দিল, যার ফলে এল নব জাগরণ (Renaissance)। বিজ্ঞানের নব জীবনলাভের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-রাষ্ট্রের ভিত্তি শিথিল হ'তে লাগল। আর তার স্থানে দেখা দিল রাষ্ট্রীয় জীবনের নূতন এক আদর্শ—জাতীয়তাবাদ (Nationalism)। এই আদর্শই এখন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ দখল ক'রে আছে। এরই অভিনয় বিশ্ববাসী কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে। ভবিষ্যতে হয়তো অপর কোন রাষ্ট্রীয় আদর্শ এসে বর্ত্তমানের এই জীবন্ত প্রাণবন্ত আদর্শকে জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিতাড়িত করবে। যাক সে সুদূর ভবিষ্যতের কথা! আমাদের সে কথা ভাববার দরকার নাই। আপাততঃ আমাদের এই জীবন্ত জাতীয়তাবাদের কথাই ভাবা যাক, আর আমাদের ভারতীয় জীবনে এ আদর্শের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা করা যাক।

এক কথায় বলতে গেলে জাতীয়তাবাদের (Nationalism) আদর্শ হ'চ্ছে রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুবিধাজনক এক ভৌগোলিক পরিবেশ বা এলাকার মধ্যে মূর্ত্ত ক'রে তোলা; সেই ভৌগোলিক পরিবেশের প্রতি মানুষের ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা জাগিয়ে তোলা; তার সেবায়, তার মুক্তি এবং মঙ্গলের সাধনায় মানুষের সর্ব্ববিধ শক্তি এবং প্রয়াসকে পরিচালিত করা; এবং সেই ভৌগোলিক পরিবেশকে সর্ব্বপ্রকার সামবায়িক জীবনের স্নায়বিক কেন্দ্রে পরিণত করা। এই ভাবেই বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন জাতীয়তামূলক রাষ্ট্রতন্ত্র গড়ে' উঠেছে, আর তারাই এখন মানবজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইউনাইটেড ষ্টেটস্, জাপান প্রভৃতির কথা কে না জানেন ?

জাতীয়তার আদর্শ এ যুগে এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করার কারণ কি ?

প্রথম কারণ : এ আদর্শের নির্দ্দিষ্ট একটা ভৌগোলিক রূপ আছে। দেশপ্রেম বললে দেশের প্রতি প্রেম, কোনখানে তার সীমানা, কোনটা বিদেশ, দেশের মানুষ কারা, দেশের মানুষ কারা নয়, কারা প্রতিবেশী, কারা প্রতিবেশী নয়, এই সব প্রয়োজনীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা মানুষের মনে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, আর তার ভাব ও অনুভূতিকে বিশেষ একটা রূপ দিতে, তার প্রয়াসকে সুনির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় কারণ : সাধনার এবং কর্ম্মের বৈধতা এবং অবৈধতার সহজবোধ্য এবং প্রমাণসাপেক্ষ একটা মাপকাঠির (Standard) আদর্শ আমাদের হাতে তুলে দেয়। দেশের মঙ্গলের দিক্ থেকে বিচার করলে কোন কাজটা দেশের পক্ষে কল্যাণকর, আর কোন কাজটা কল্যাণকর নয় ; কোন আন্দোলন থেকে দেশের মঙ্গল হ'বে, কোন্ আন্দোলন থেকে দেশের অনিষ্ট হ'বে ; কারা দেশের উপকার করছে, কারা দেশের অনিষ্ট করছে—এ সব সহজে বোঝা যায়।

তৃতীয় কারণ : দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের অতি-প্রয়োজনীয় শাস্ত্রসমূহের আলোচনায় এ আদর্শ কোন বিঘ্নের সৃষ্টি তো করেই না, পক্ষান্তরে এ সকলের আলোচনা এবং সাধনা যাতে ব্যাপকভাবে হয়, তার জন্য এ আদর্শের সমর্থকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কেন না, তাঁরা জানেন, দর্শন এবং বিজ্ঞানের উন্নতির উপর এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসারের উপর জাতীয় মঙ্গল একান্তভাবে নির্ভর করে। মানুষ ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, কি করে না, দেবতাদের বিষয়ে কে কি ধারণা মনে পোষণ করে, পরকাল বিশ্বাস করে কি না—জাতীয়তাবাদ তা' নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাই বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদীরা এ-আদর্শের সেবায় এবং সাধনায় সহজে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে আত্মনিয়োগ করতে

পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চীনের রাষ্ট্রনেতা চিয়াং কাইশেকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি আর তাঁর সহধর্ম্মিণী হ'লেন মেথডিষ্ট (Methodist) মতবাদী খৃষ্টান, অথচ এই বিষম জাতীয় সঙ্কটের সময়ে তাঁরা এমন এক দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে পরিচালিত করছেন, যার অধিকাংশ অধিবাসীই ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। একমাত্র জাতীয়তামূলক রাষ্ট্রেই এ ঘটনা সম্ভব।

চতুর্থ কারণ: এ-আদর্শের স্বাভাবিক সংবেগ (Natural tendency) হ'চ্ছে নির্দ্দিষ্ট এক জনসমিতিকে বিভেদের পথে নিয়ে না গিয়ে ঐক্যের এবং সম্প্রীতির পথে নিয়ে যায়। এ আদর্শ এমন সব বিষয়ে মতের ঐক্য দাবী করে, যে সব বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা অল্প; এবং যে সব বিষয়ে মতদ্বৈধের সম্ভাবনা আছে, অথচ সে মতভেদ দূরীকরণের কোন পরীক্ষামূলক মাপ (tangible test) নাই, সে সব বিষয়ে এ আদর্শ ঐক্যের প্রত্যাশা রাখে না, কিম্বা ঐক্য-সৃষ্টি করবার কোন রকম কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে না। সেজন্য জাতীয়তার আদর্শ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির এবং আলোচনার যুগে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী কালোপযোগী।

পঞ্চম কারণ: এই জাতীয়তার আদর্শ মানুষকে সর্ব্ববিধ সামবায়িক সাধনার প্রশস্ততম ক্ষেত্রের সন্ধান দেয়। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কিছু করতে গেলেই প্রশ্ন ওঠে, কে আমার স্বধর্ম্মী, আর কে স্বধর্ম্মী নয়। তারপর প্রশ্ন ওঠে, ধর্ম্মের বিষয়ে কে আচারসম্মত মত পোষণ করে, আর কে তা' করে না! তারপর প্রশ্ন ওঠে, ধর্ম্মের ধুরন্ধরেরা এ বিষয়ে কি ভাবেন? যাঁরা ধর্ম্মগত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কিছু করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরাই জানেন, সে কি দুরূহ ব্যাপার! প্রগতিপন্থী ব্যক্তি-মাত্রকেই ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে ফিরতে হয়েছে। জাতীয়তার আদর্শে এসব

বাধা আসে না। এ-পথে মানুষ সহজেই দেশপ্রেমিকের সহযোগিতা লাভ করতে পারে এবং সাধনাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে।

ষষ্ঠ কারণঃ জাতীয়তাবাদের আদর্শ মানুষের দৃষ্টিকে স্বভাবতঃ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়। অতীতের আনুগত্য তার দৃষ্টিকে অন্ধ এবং তার সাধনাকে পঙ্গু করে না। সে জাতির মঙ্গলের কথা আর তার ভবিষ্যতের কথাই ভাবে। সেই দৃষ্টি নিয়েই সমস্যার আলোচনা আর বিচার সে করে; অতীতের অকাট্য শাস্ত্রবাক্যের মাপকাঠি নিয়ে বর্ত্তমান সমস্যার আলোচনা কিম্বা সিদ্ধান্ত সে করে না।

সপ্তম কারণঃ এ আদর্শ মানুষের সর্ব্ববিধ মঙ্গল-সাধনাকে ব্যাপক এবং বৃহত্তর মঙ্গলের সাধনায় নিয়োজিত, সংযোজিত এবং নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। মানুষ যে ক্ষেত্রেই কাজ করুক না কেন, তার কাজের একটা সামাজিক মূল্য আছে। তার কাজ থেকে সমাজের উপকার হ'বে কি না, কতটা উপকার হ'বে, তার কাজে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে কি না, তার কাজে ইষ্টের সম্ভাবনা বেশী কি অনিষ্টের আশঙ্কা বেশী, এ সব বিষয় জাতীয়তার আদর্শ থেকে বিচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং মতের ঐক্য-স্থাপন করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। ধর্ম্মগত আদর্শের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না।

অষ্টম কারণঃ এ আদর্শ প্রত্যেক নাগরিককে সহজবোধ্য এক অধিকার দেয় আর তার স্কন্ধে সহজবোধ্য দায়িত্ব স্থাপন করে। প্রত্যেক নাগরিকই তার অধিকার এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সহজে অবহিত হ'তে পারে। তা' ছাড়া, তার অধিকার এবং দায়িত্ব নিয়ে সে যদি অসন্তুষ্ট হয়, তা' হ'লে তার প্রতিবিধানের সহজ উপায়ও তার করায়ত্ত। আলোচনা এবং আন্দোলনের সাহায্যে সে দায়িত্ব এবং অধিকারের অনুপাত এবং তার সীমানা তার মর্জ্জি-মাফিক সে ক'রে নিতে পারে।

সেজন্য জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহের ভাব সহজে তার মনে জাগে না।

নবম কারণ : এই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতে এ আদর্শ সেবার এবং সাধনার নিত্য নূতন পথে যেতে মানুষকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করে। দেশের মঙ্গল যখন আদর্শ, তখন কিসে সে মঙ্গল সাধন করা যেতে পারে, সেই দিকেই মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, অন্য কোন অবান্তর কথা ভাববার তার সময় থাকে না এবং সেই মঙ্গল-সাধনের জন্য মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নিত্য নূতন পথে অগ্রসর হয়। কেন না, সে বোঝে যে, অতীতের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন পন্থা প্রাচীন পন্থার চেয়ে ভাল। প্রাচীন-পন্থীদের মতামত, সমর্থন বা অসমর্থন তার সহজ বুদ্ধিকে বিকৃত কিম্বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করে না।

মধ্যযুগে ধর্ম্মই ছিল রাষ্ট্রের ভিত্তি। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্র ইউরোপে নাই। ধর্ম্ম সেখানে এখন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না, মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন এবং তার পারলৌকিক মঙ্গল নিয়েই থাকে। প্রাচ্যের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহেও ধর্ম্ম এখন রাষ্ট্রীয় অধিকার থেকে দ্রুত বঞ্চিত হ'চ্ছে। তুরস্ক, ইরাণ, চীন, জাপান প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ নয়। এখানকার রাষ্ট্রীয় জীবন অনেকাংশে বৈদেশিক শক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। জনসাধারণের মধ্যে কিন্তু দু'টি আদর্শের প্রভাব কার্য্যকরী ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। একটি—প্রাচীন ধর্ম্মমূলক আদর্শের; দ্বিতীয়টি—আধুনিক জাতীয়তার আদর্শের।

ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব কি? এ আদর্শ কি বর্ত্তমান যুগে চলতে পারে? রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রাখা কি বর্ত্তমান যুগে বাঞ্ছনীয়?

এখন এই সব সমস্যার আলোচনা করা যাক। তবে এ স্থানে ব্যক্তিগত একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার মনে করি। ধর্ম্মে আমি একান্ত ভাবে আস্থা রাখি, আর ধর্ম্মকে আমি জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ ব'লেই মনে করি। তবে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাধনার উপর ধর্ম্মের পূর্ত্তি ও পুষ্টি বলা যায়।

রাষ্ট্রের কারবার হ'ল ইহজীবনের স্বার্থ এবং সুবিধা নিয়ে; ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা, বংশগত স্বার্থ-সুবিধা, শ্রেণীগত স্বার্থ-সুবিধা, জাতিগত স্বার্থ-সুবিধা—এই সব স্বার্থ-সুবিধা নিয়েই রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কারবার। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে (নির্ব্বাচন প্রভৃতিতে) যে দল জয়ী হয়, সে দল স্বার্থের দিক্ থেকে যথেষ্ট লাভবান্ হয়; পক্ষান্তরে, যে দল পরাজিত হয়, সে দল স্বার্থের দিক্ দিয়ে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় যাঁদের আছে, তাঁরা জানেন—রাষ্ট্রের কারবারই হ'ল এযুগে সব চেয়ে বড় কারবার। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক্ না করলে, ধর্ম্ম আর ধর্ম্মই থাকে না, বড় একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয় আর ধর্ম্ম ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ার মানেই হ'ল তার মৃত্যু! কেন না, সে অবস্থায় ধর্ম্মের নামে যে সব জীগীর ছাড়া হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের বুলি নয়, স্বার্থের উদ্বমন। তা'ছাড়া সেরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের গুরুত্বপূর্ণ পদে নানা রকম চালাকি এবং ফন্দির সাহায্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হ'ন, তাঁদের কাছে ধর্ম্মের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের মূল্যই বেশী। প্রকৃত ধর্ম্মের ভিত্তি হ'ল ত্যাগ, সংযম আর পবিত্রতা। এ দুই আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অর্থসম্পদের নিবিড় সংযোগ কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। সে সংযোগ যেখানে হয়েছে, সেইখানেই স্বার্থ প্রকৃত ধর্ম্মের আসন

দখল করেছে! অর্থ নিজেকে সেখানে পরমার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে!

তারপর ধর্ম্মে যেমন শাশ্বত সত্য আছে, তেমনি এমন অনেক জিনিষ আছে, যাকে আপেক্ষিক সত্য (Relative Truth) বলা যেতে পারে—যাদের যৌক্তিকতা এবং বৈধতা বিশেষ এক যুগ কিম্বা বিশেষ এক বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ—যা' বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা এবং ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না। ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখতে' পাওয়া যায়—যাঁরা প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁরা ধর্ম্মের শাশ্বত অংশের উপরেই ধর্ম্মসাধনার ভিত্তি স্থাপন করেন; আর ধর্ম্মের আপেক্ষিক অংশগুলিকে যুগ এবং স্থানোপযোগী ক'রে নেবার চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে, যাঁরা ধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শের সঙ্গে সংস্রব রাখেন না, অথচ ধর্ম্মকে উপলক্ষ ক'রে ধর্ম্মেতর আদর্শের অনুসরণ ক'রতে চান, তাঁরা ধর্ম্মের শাশ্বত এবং চিরন্তন আদর্শগুলিকে বর্জ্জন করেন, এবং তার আপেক্ষিক অংশগুলিকে অবলম্বন ক'রে প্রকৃত ধার্ম্মিক এবং সত্যসাধকদের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করেন। এই সহজ উপায়ে ধর্ম্মের ধুরন্ধররূপে তাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রবার চেষ্টা করেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক যীশু খৃষ্টকে তাই তথাকথিত ধর্ম্মের রক্ষক ফ্যারাসীদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ ক'রে শেষে মামুলি একজন অপরাধীর মত ক্রস-কাষ্ঠে দেহত্যাগ করতে হয়েছিল। এইখানেই হ'ল ধর্ম্মমূলক সভ্যতার এবং ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্বাভাবিক এবং মৌলিক দুর্ব্বলতা।

ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্যকে জনসাধারণ সহজে বুঝতে পারে না। সে বিষয়ে সাধারণতঃ তারা মনে ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ ক'রে থাকে। যে সব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ধর্ম্মের শাশ্বত সত্যের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেন, তারা তাঁদের ধর্ম্মের শত্রু মনে ক'রে

লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত করে। আর যে সব সঙ্কীর্ণমনা স্বার্থসেবী তাদের কুসংস্কারে প্রশ্রয় দেয়, তাদের তারা ধর্ম্মের এক একটি ধুরন্ধর মনে করে, প্রকৃত ধর্ম্মাত্মাদের লাঞ্ছনায় তাদেরই নির্দ্দেশ এবং ইঙ্গিতের অনুসরণ করে। ধর্ম্ম যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেছে, সেইখানেই শাশ্বত সত্যের বিরুদ্ধে, প্রকৃত ধর্ম্মাত্মাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় উৎপীড়নের অভিযান চালিত হয়েছে, আর তার ফলে উন্নতির পথ ছেড়ে সমাজের অধোগতি হয়েছে; ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অন্ধ কুসংস্কারের সঙ্গে দুর্ব্বার রাষ্ট্রশক্তি যোগ দিয়েছে আর উভয়ে মিলে সত্যকে পদদলিত করেছে। ধর্ম্মকে রাষ্ট্রশক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মানেই হ'চ্ছে সেই অতীত যুগের বর্ব্বরতার পুনরভিনয়। আজ আর কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সে পথের সমর্থন করতে পারে না।

তারপর যে সব তথ্যের আলোচনা, যে সব বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা এবং মতবাদ ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়, সেই সব তথ্য এবং বিষয় নিয়ে দর্শন এবং বিজ্ঞান আলোচনা করেছে এবং নিত্যই করছে। তবে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন, আর উভয়ে বিচারের ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মানদণ্ড ব্যবহার করে। ধর্ম্মের মানদণ্ড (Authority) হ'চ্ছে শাস্ত্রশাসন ও শাস্ত্রকারের বাণী; আর বিজ্ঞানের মানদণ্ড হ'চ্ছে পরীক্ষামূলক বাস্তবতার তশদীক (verification) বা সমর্থন। ধর্ম্ম দেখে, বিশেষ কোন মতবাদের সমর্থন ধর্ম্মের মূল গ্রন্থে কিম্বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদের প্রামাণ্য উক্তি ও চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যায় কি না। দর্শন এবং বিজ্ঞান দেখে —মতবাদটি বাস্তব জগতের সঙ্গে (objective reality) সঙ্গে খাপ খায় কি না। এরূপ অবস্থায় প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গে দর্শন এবং বিজ্ঞানের সংঘর্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিবার্য্য। এ সংঘর্ষের অসংখ্য দৃষ্টান্ত মধ্যযুগীয় ইউরোপের ইতিহাসে পাওয়া যায়। সেই সংঘর্ষের ফলেই জাতীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছে। ধর্ম্ম না হ'লে

সমাজ চলে না—একথা যেমন সত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান না হ'লেও সমাজ চলতে পারে না—সে কথাও তেমনি সত্য। এরূপ অবস্থায় বিশেষ এক পক্ষকে অর্থাৎ ধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করার মানে হ'চ্ছে দর্শন এবং বিজ্ঞানের মূলোৎপাটন করা।

আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের দৃষ্টি স্বভাবতঃই অতীতের দিকে; পক্ষান্তরে, বর্ত্তমান যুগের বিশ্বমানবের দৃষ্টি হ'ল ভবিষ্যতের দিকে। মানুষ সব দেশেই এখন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে জীবন এবং রাষ্ট্রসাধনা করে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম কিন্তু মানুষকে অহরহ অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আর অতীতের জগতে ফিরে যাবার জন্য তাকে আহ্বান করে। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান যুগের মানসিকতার সঙ্গে অতীতের আচারানুষ্ঠান এবং মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ধর্ম্মের সংঘর্ষ অনিবার্য্য, আর সে সংঘর্ষ প্রকৃতপক্ষে অবিরামভাবেই চলেছে। এরূপ অবস্থায় অনুষ্ঠানমূলক সামাজিক ধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভূষিত করার অর্থ হ'চ্ছে প্রগতির সর্ব্ববিধ পথকে অর্গলবদ্ধ করা।

এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধাদি অতীতের প্রয়োজন, অতীতের জীবনাদর্শ এবং অতীতের বেষ্টনীর তাগিদেই সৃষ্ট এবং তাদেরই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সুদূর অতীতের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী হ'লেও, এ সব বিধি-নিষেধ, আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান মানবের উন্নতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে; ধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে এই সব বাধা-বিঘ্ন চিরন্তন রূপ ধারণ করবে, আর মানুষের উন্নতির সর্ব্ববিধ প্রয়াসকে ব্যর্থ ক'রে দেবে।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের সবচেয়ে বড় দুর্ব্বলতা হ'চ্ছে এই যে, তার প্রকৃতি হ'ল মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করা, মানুষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে

বিভক্ত করা এবং সেই গণ্ডীগুলিকে ধর্ম্মের আকার দিয়ে চিরস্থায়ী ক'রে তোলা। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্মই এই পথে গিয়েছে। ফলে সর্ব্বত্র এমন এক আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুষের পক্ষে ব্যাপকভাবে একত্র কোন কাজ করা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; মিলনের সর্ব্বজনমান্য কোন আদর্শ কায়েম করতে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম কোথাও সমর্থ হয়নি।

এ কথাও আমাদের ভুললে চলবে না যে, বর্ত্তমান যুগে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা এতদূর প্রসারলাভ করেছে, তাদের মনে জিজ্ঞাসার ভাব এতখানি প্রবল হ'য়ে উঠেছে, প্রমাণের প্রয়োজন এত গভীর এবং ব্যাপকভাবে তারা অনুভব করতে শিখেছে, দর্শন এবং বিজ্ঞান এত দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে, নিত্য নূতন তথ্য এসে তাদের মনকে এমন গভীর ভাবে আলোড়িত করছে, বিভিন্ন দেশ, সমাজ এবং কৃষ্টির মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান নিত্য এমন ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠছে যে, এ যুগে দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অতীতের ধারণাকে সমাজে কায়েম-বন্দী ক'রে রাখা সত্যই অসম্ভব। তাই এ যুগে সেই অতীত যুগের ভাব এবং চিন্তাধারার উপর কোন রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টাকে বাতুলতা ছাড়া আর কোন নামে অভিহিত করা সঙ্গত মনে হয় না।

এই সব বিভিন্ন কারণের সমবেত ফল এই হয়েছে যে, ইউরোপ ভূখণ্ডে ধর্ম্ম-রাষ্ট্রের অবসান ঘটেছে, আর প্রাচ্যের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিও দ্রুত সেই একই পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। ভারতবাসীর তথা বাঙালীর পক্ষেও এ যুগধর্ম্মের অনুসরণ করা ছাড়া উন্নতির এবং সার্থকতার অন্য কোন পথ নাই। তাকেও এখন জাতীয়তার ভিত্তির উপরেই রাষ্ট্রীয় জীবন গড়তে হ'বে। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর যে প্রতিষ্ঠান গড়তে গেলে বিড়ম্বনা হ'বে। বাঙালী এ বিষয়ে অবহিত হ'বে কি?

রাষ্ট্র ও নাগরিক

একই ধরণের শাসনপ্রণালী এক দেশে আনে সুখ এবং সমৃদ্ধি; আর অন্য দেশে আনে দুঃখ, অশান্তি আর অরাজকতা। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রায় সেই ধরণের শাসনপ্রণালীই প্রচলিত আছে—যার দ্বারা ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হ'চ্ছে। অথচ পূর্ব্বোক্ত দেশগুলি অশান্তিময়; অন্তর্বিপ্লব, অরাজকতা প্রভৃতি ঐ সব দেশের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার; আর শেষোক্ত দেশগুলিতে এসব গ্লানি প্রায় দেখাই যায় না। এই আমাদের ভারতবর্ষেই বিলাতের ধরণের মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্তশাসন এখন প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত, অথচ এদেশের প্রত্যেক করদাতাই মিউনিসিপ্যালিটীর অনাচারের বিষয়ে অভিযোগ ক'রে থাকেন। বিলাতে এরকম অভিযোগ একান্ত বিরল। এই বৈষম্যের কারণ কি?

রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল যতটা শাসনপ্রণালীর উপর নির্ভর করে, তার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভর করে রাষ্ট্রনায়কদের এবং নাগরিকদের চরিত্রের এবং দায়িত্বজ্ঞানের উপর। রাষ্ট্রনায়কদের যদি দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে এবং নাগরিকরা যদি তাঁদের দায়িত্ব, কর্ত্তব্য এবং অধিকার সম্বন্ধে

যথাযথভাবে অবহিত হ'ন, তা'হ'লে যে কোন শাসনপ্রণালীতেই দেশে সুখ এবং সমৃদ্ধি না এসে থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রনেতাদের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান যদি শিথিল হয় এবং রাষ্ট্রের জনসাধারণ যদি তাঁদের দায়িত্ব, অধিকার এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উচিতভাবে সজাগ এবং অবহিত না হ'ন, তা'হ'লে কোন ধরণের শাসনপ্রণালী থেকেই সুফলের আশা করা যায় না। সে অবস্থায় রাষ্ট্রে দুঃখ, অশান্তি এবং অরাজকতা অাসা অনিবার্য্য। রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল প্রকৃতপক্ষে জাতির চরিত্র, ন্যায়নিষ্ঠা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে।

যে সব প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ বিভিন্ন জাতিকে গঠন করেছেন, বিভিন্ন সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁরা এই সত্যকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতেন—চরিত্রসৃষ্টির দিকে বিশেষভাবে তাঁরা মনোনিবেশ করেছিলেন এবং বিধিনিষেধ, ধর্ম্মানুসাশন, নৈতিক উপদেশ প্রভৃতির সাহায্যে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির চরিত্রকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। রোমের দ্বাদশ অনুশাসনের (Twelve tables) প্রণেতারা, গ্রীসের সোলোন, লাইসারজাস্ প্রভৃতি রাষ্ট্র-জনকেরা, ভারতবর্ষের মনু, বেদব্যাস প্রভৃতি সমাজস্রষ্টারা, চীনের সমাজগুরু কনফুসিয়াস, ইহুদিদের জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠাতা মুসা, মুসলিম জাতির গুরু এবং পথপ্রদর্শক হজরত মোহাম্মদ প্রভৃতি সকলেই মানবচরিত্রের এবং সমাজজীবনের উৎকর্ষসাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাঁরা স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, জাতির মঙ্গলামঙ্গল একান্তভাবে নির্ভর করে ব্যষ্টিচরিত্রের উৎকর্ষের উপর। এই সব মহাপুরুষদের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে তাঁদের তথাকথিত শিষ্যের দল এখন অর্থহীন ক্রিয়াকলাপকেই তাঁদের শিক্ষার মূল বস্তু ধরে নিয়েছেন আর এর ফলে তাঁদের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ ক'রে

দিয়েছেন। তবে সত্য সত্যই থেকে যায়। যখন যে জাতি সত্যের অনুসরণ করে, তখন সে জাতি বড় হয়; আর যখন কোন জাতি সত্যকে ছেড়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তখন সে জাতির পতন ঘটে। ব্যষ্টির চরিত্র উন্নত না হ'লে, সমষ্টির কখনও মঙ্গল হ'তে পারে না। জনসাধারণের মনে এবং জীবনে উচ্চ আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত না হ'লে, সমষ্টির জীবনে কখনও সুখ, শান্তি এবং সুশৃঙ্খলা আসতে পারে না—রাষ্ট্রের বাইরের আকার যাই হ'ক না কেন।

স্পার্টা এক সময়ে জগতের অন্যতম আদর্শ রাষ্ট্ররূপে গণ্য হ'ত। স্পার্টার রাষ্ট্রগুরু হ'চ্ছে লাইসারজাস। তাঁর জীবনের আলোচনাপ্রসঙ্গে দার্শনিক প্লুটার্ক (Plutarch) বলেছেন :—

Upon the whole he taught his citizens to think nothing more disagreeable than to live by (or for) themselves. Like bees, they acted with one impulse for the public good and always assembled about their prince. They were possessed with a thirst for honour, an enthusiasm bordering upon insanity and had not a wish but for their country.

দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, আমাদের দেশের লোকের চরিত্রে সে একাগ্র দেশপ্রেম দেখতে পাওয়া যায় না যা' সাধারণ মানুষকে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। সে ন্যায়নিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায় না—যা' সাধারণ মানুষকে বা সাধারণ রাজকর্ম্মচারীকে জনসেবায় অনুপ্রাণিত করে। সেই নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা দেখতে পাওয়া যায় না—যা' ক্ষমতাশালীকে কর্ত্তব্যপালনে বাধ্য করে; সেই দেশাত্মবোধ (public spirit) দেখতে পাওয়া যায় না—যা' মানুষকে অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কৃতসঙ্কল্প করে; আর স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার প্রতি ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণাও দেখতে পাওয়া যায় না—যা' মানুষকে এইসব

গ্লানি বর্জ্জন করতে বাধ্য করে। সুস্থ, উন্নতিশীল রাষ্ট্রীয় জীবনের এই সব গুণাবলীর অভাব যতদিন আমাদের মধ্যে থাকবে, ততদিন শাসন-তন্ত্রের আকার-প্রকারের সংস্কার এবং পরিবর্ত্তন থেকে আমরা বিশেষ কোন সুফলের আশা করতে পারি না।

প্রকৃতপক্ষে এই গত কয়েক বৎসরে আমরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কিছু কিছু পেয়েছি, আর অদূর ভবিষ্যতে যে আরও অনেক কিছু আমাদের হাতে আসবে, সেটা আশা করা অসঙ্গত হবে না। তবে যে ক্ষমতা আমাদের হস্তগত হয়েছে, তার যে প্রকৃত সদ্ব্যবহার করতে পারিনি, তার কারণ হ'চ্ছে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন নৈতিক-দুর্ব্বলতা—আর এই দুর্ব্বলতা যতদিন থাকবে, ততদিন ক্ষমতার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করতে আমরা পারবও না। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন অনাচার, অত্যাচার এবং উচ্ছৃঙ্খলতার একটা দৃষ্টান্তে পরিণত হ'বে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের স্থায়িত্ব নাগরিকদের নৈতিক স্বাস্থ্যের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। যতদিন নাগরিকদের নৈতিক জীবন সুস্থ থাকে, ততদিন রাষ্ট্রও সুস্থ এবং শক্তিশালী থাকে; আর যখন নাগরিকদের নৈতিক জীবন গ্লানিপূর্ণ হয়, তখন রাষ্ট্রের জীবনও গ্লানিপূর্ণ হ'য়ে উঠে, আর সেই জরাগ্রস্ত রাষ্ট্র অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গ্রীসের সাধারণতন্ত্রগুলির পতনের আলোচনাপ্রসঙ্গে এন্‌সাইক্লো-পিডিয়া ব্রিটানিকার (Encyclopædia Britannica) সুযোগ্য লেখক বলেছেন:

'But it is to moral rather than to political or economic causes that the failure of Greece in the conflict with Macedon is attributed by the most famous Greek statesman of that age. Demosthenes is never weary of insisting upon the decay of patriotism among the

citizens and of probity among their leaders. Venality had always been the besetting sin of Greek statesmen.........In the age of Demosthenes the level of public life in this respect had sunk at least as low as that which prevails in many states of the modern world.

নৈতিক অধোগতি যেমন জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয়জীবনের পতনের সূচনা করে, পক্ষান্তরে নৈতিক উৎকর্ষ তেমনি জাতিকে রাষ্ট্রীয় উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠার পথে নিয়ে যায়। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন আরব-জাতির উত্থান-পতনের আলোচনাপ্রসঙ্গে যা' বলেছেন, তার মর্ম্ম এইরূপ:

রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব সামাজিক জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। মানুষ তার প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বভাবের দরুণ এবং ভাবপ্রকাশের শক্তির (ভাষার) অধিকারী হওয়ার দরুণ স্বাভাবিকভাবে নীচ এবং নিন্দনীয় আচরণ বর্জ্জন ক'রে প্রশংসনীয় আচরণের পথে অগ্রসর হয়। মানুষের আচরণে যে সব নিন্দনীয় কাজকর্ম্ম দেখা দেয়, তার অনাচার এবং দুর্নীতি, এসব হ'চ্ছে তার চরিত্রের পাশবিক অংশের উত্তেজনা এবং প্ররোচনারই স্বাভাবিক ফল। মানুষ হিসাবে তার স্বভাবধর্ম্ম হ'চ্ছে মঙ্গলের পথে, প্রশংসনীয় আচরণের পথে অগ্রসর হওয়া। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রধর্ম্ম হ'চ্ছে মানবধর্ম্মের, মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক সুচারু-বিকাশ। আর তাই রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রধর্ম্মের সম্যক্ বিকাশের জন্য মানুষের প্রশংসনীয় গুণাবলীরও সম্যক বিকাশের প্রয়োজন। ন্যায় এবং সদ্বিচারের ভিত্তির উপরই সমাজজীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। এই হ'ল প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি। আর স্বাভাবিকভাবে মানুষ এই ধরণের জীবনযাত্রার জন্মগত শক্তি এবং অধিকার রাখে। তার জন্য যে গুণাবলীর প্রয়োজন, প্রকৃতি তাকে তা' দিয়েছে।

স্বজাতিপ্রীতি এবং জাতির জন্য ত্যাগস্বীকারই হ'চ্ছে প্রকৃত আভিজাত্যের মূল। ভদ্র ব্যবহার এবং স্বাধীনতা হ'চ্ছে সেই আভিজাত্যের শাখা-প্রশাখা। এই সব গুণাবলীর সাহায্যেই আভিজাত্য পূর্ণতা লাভ করে, আর এদের সাহায্যেই তার সম্যক্ বিকাশ হয়।

সাম্রাজ্য যেমন স্বজাতিপ্রীতির স্বাভাবিক ফল, তেমনি মহৎ চরিত্র এবং ভদ্র ব্যবহারের ফলও বটে। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রের মহত্ত্ব ও ভদ্র-আচরণবর্জ্জিত যে স্বজাতিপ্রীতি, সে হ'চ্ছে কতকটা অঙ্গহীন অথবা উলঙ্গ মানুষেরই মত। আমাদের মেনে নেওয়া দরকার যে, মহত্ত্বহীন, ভদ্রতাহীন জাতীয়তা একটা অভিজাতবংশের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়। তাই যদি হয়, তা'হ'লে এই সব গুণাবলীর অভাব কি একটা জাতির সমূহ ক্ষতি এবং দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ হ'বে না ?

আমরা সেই সব স্বজাতিপ্রেমিক জাতিদের দিকে যদি লক্ষ্য করি, যাদের রাজ্য দূর-দূরান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যারা বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন সমাজের উপর আধিপত্য করছে, তা'হ'লে দেখতে পাব যে, সেই সব জাতির প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ভদ্রতা এবং প্রশংসনীয় আচার-ব্যবহার সম্যক্‌ভাবে বর্ত্তমান আছে। দয়া, দাক্ষিণ্য এবং সহনশীলতা হ'চ্ছে তাঁদের স্বভাবধর্ম্ম। অসহায় এবং উৎপীড়িতের দুঃখ তাঁরা কাণ দিয়ে শুনেন। আতিথেয়তা তাঁদের নিত্যকার ব্রত। তাঁরা শ্রমকাতর নন। সাধনায় তাঁরা মোটেই বিমুখ নন। অন্যের নীচ আচরণ তাঁরা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করেন। প্রতিশ্রুতিপালনে তাঁরা একনিষ্ঠ। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তাঁরা অকাতরে ত্যাগস্বীকার এবং অর্থব্যয় করেন। ধর্ম্ম-গুরুদের তাঁরা যথেষ্ট সম্মান করেন। ধর্ম্মের পথ থেকে তাঁরা বিচলিত হ'ন না। ধার্ম্মিকদের তাঁরা ভক্তি করেন এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁদের উপদেশ তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেন। তাঁদের

আশীর্ব্বাদ পাবার জন্য তাঁরা লালায়িত। সাধু, সুফী, দরবেশ প্রভৃতিদের তাঁরা যথেষ্ট সম্মান করেন। শালীনতা এবং ভদ্রতার পথ কখনও তাঁরা বর্জ্জন করেন না। ন্যায়কথা যার মুখ থেকেই আসুক না কেন, সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁরা তা' শুনেন, আর তার নির্দ্দেশমত কাজ করেন। দুর্ব্বলের প্রতি তাঁরা ন্যায়বিচার করেন, তাদের প্রতি তাঁরা করুণা দেখান। মুক্তহস্তে তাঁরা দান করেন, অকাতরে তাঁরা খরচ করেন। দরিদ্রের সঙ্গে নম্রভাবে তাঁরা মেলামেশা করেন। ধৈর্য্যের সঙ্গে বিচারপ্রার্থীর আবেদন তাঁরা শুনেন। ধর্ম্মকর্ম্মে, খোদার এবাদত বন্দেগীতে তাঁরা কখনও শৈথিল্য করেন না। ভণ্ডামি, ধর্ম্মদ্রোহিতা, শপথভঙ্গ প্রভৃতি নীচতা তাঁরা বর্জ্জন ক'রে চলেন। এই সবই হ'চ্ছে রাজার যোগ্য গুণাবলী। এই সবের বলেই তাঁরা রাজত্ব করেন, এই সবের বলেই তাঁরা রাজক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, আর এই সবের দরুণই জনসাধারণের উপর তাঁদের আধিপত্য। আর এও নিশ্চিত যে, খোদা বা সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁদের স্বজাতিপ্রেম এবং ঐশ্বর্য্যের অনুপাতে এই সব গুণাবলীর দ্বারা তাঁদের বিভূষিত করেছেন। এই সব গুণাবলী অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় মোটেই নয়। সাম্রাজ্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাঁদের স্বজাতিপ্রেম এবং সদ্গুণাবলীর স্বাভাবিক পরিণতি মাত্র।

বোঝা যাচ্ছে বিশ্বনিয়ন্তা যখন কোন জাতিকে রাজ্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিতে চান, তখন তিনি তাদের স্বভাব-চরিত্রকে সংশোধিত করেন এবং বিবিধ সদ্গুণাবলীর দ্বারা তাদের বিভূষিত করেন। পক্ষান্তরে তিনি কোন জাতিকে রাজ্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে তখনই বঞ্চিত করেন, যখন সেই জাতির স্বভাব-চরিত্রে বিভিন্ন রকমের আবিলতা এসে দেখা দেয়, নানা রকম পাপপ্রবৃত্তি তাদের জীবনে আত্মপ্রকাশ করে, তাদের মধ্যে থেকে প্রশংসনীয় গুণাবলী অদৃশ্য

হয়; আর বিভিন্ন প্রকারের অনাচার এবং গর্হিত আচরণ আত্মপ্রকাশ করে। ধীরে ধীরে রাজ্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাত থেকে অন্যের হাতে চলে যায়। বিশ্বস্রষ্টা এই ভাবে দেখান যে, তিনি সেই হতভাগ্য জাতির অনাচার-অত্যাচারে বিরক্ত হ'য়ে তাঁর কৃপা এবং তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব তাদের কাছ থেকে তুলে নিয়েছেন, আর তাদের যায়গায় তাদের চেয়ে চরিত্রবান্ এবং যোগ্যতর জাতির উপর তাঁর প্রতিনিধিত্বের এবং বিশ্ববাসীর প্রতিপালন, রক্ষা এবং শাসনের ভার অর্পণ করেছেন। প্রাচীন জাতিসমূহের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, রাষ্ট্রের উত্থান-পতন এবং একের হাত থেকে অন্যের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যাওয়া-আসা আবহমানকাল থেকে এইভাবেই চলে আসছে।

ইবনে খালদুন অতি খাঁটি, অতি সত্য কথাই বলেছেন। জাতির চরিত্রের উৎকর্ষই হ'চ্ছে তার সর্ব্ববিধ উন্নতির, তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল উৎস। আমরা যদি সত্যই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হ'তে চাই, তা'হ'লে আমাদের জাতীয় চরিত্রকে তার উপযোগী ক'রে তুলতে হ'বে। কতকগুলি দুর্ব্বলতা আমাদের জাতীয় চরিত্রে সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় যার প্রতিপত্তি আছে, তাকেই আমরা মাথায় তু'লে নিতে চাই। ভক্তি আমাদের এত বেড়ে যায় যে, প্রতিবাদ এবং সমালোচনার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে আমরা হারিয়ে ফেলি। যাঁরা ক্ষমতা পান, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত এবং বংশগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করেন। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সত্যের অপলাপ আমাদের দেশে নিত্যকার ঘটনা। আত্মসম্মান যে মনুষ্যত্বের প্রধান গুণ এবং সর্ব্ববিধ গুণাবলীর উৎস, সে কথা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের মানুষ ভুলে যায়। মিথ্যা এবং ভণ্ডামির সাহায্যে যিনি ক্ষমতা লাভ করেন, তাঁর

জয়গান করতে আমরা বড় একটা কুণ্ঠা দেখাই না। ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত না লাগলে, অন্যায়ের প্রতিবাদে আমাদের দেশের লোক বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। কথার পটুতা কাজের পটুতার চেয়ে এদেশে অনেক বেশী। বড় বড় কথা বলার অভ্যাস আমাদের আছে, কিন্তু কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজন আমরা অনুভব করি না। আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে স্বাধীন উন্নতিশীল কোন দেশের জনসাধারণের তুলনা করলেই আমাদের জাতীয় চরিত্রগত দুর্ব্বলতা সহজে ধরা পড়ে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বলবার দরকার হয় না।

জাতির মঙ্গলের জন্য, রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য চরিত্র যে কত প্রয়োজনীয়, একটা দৃষ্টান্ত দিলে সহজেই তা' বোধগম্য হ'বে। ধরা যাক, আত্মরক্ষার জন্য একটা জাতিকে ক্ষমতাশালী অপর এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে হ'ল। সাফল্যের সঙ্গে যদি সেই যুদ্ধ চালাতে হয় তা' হ'লে কি কি জিনিষের দরকার হ'বে? প্রথমতঃ দরকার, রাষ্ট্রবাসীদের মধ্যে সাহসের, বিপদ্‌কে তুচ্ছ ক'রে দেখবার ক্ষমতার। কাপুরুষ যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারে না। সাহস হ'চ্ছে বড় নৈতিক গুণ।

তারপর দেশের জন্য, দশের জন্য আত্মোৎসর্গের প্রেরণা এবং ক্ষমতা থাকা চাই। দেশের এবং দশের মঙ্গলের চেয়ে যে নিজের জীবনকে মূল্যবান্ ব'লে মনে করে, সে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাতে পারে না; দেশের সম্মিলিত শক্তি যাঁরা পরিচালিত করবেন, তাঁদের মধ্যে যদি কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং ন্যায়নিষ্ঠা না থাকে, তা'হ'লে সবই পণ্ড হ'য়ে যাবে। জনসাধারণের মনে যদি এ ধারণা জন্মে যে, দেশের নেতারা যুদ্ধকে উপলক্ষ ক'রে নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন, তা'হ'লে দেশরক্ষার ব্যাপারে তাদের সব উৎসাহ, সব উদ্দীপনা নিভে যাবে; যুদ্ধের জন্য স্বার্থ এবং জীবনবিসর্জ্জন করবার মত মনের অবস্থা তাদের আর থাকবে না।

সমর-সাধনা সার্থক করতে হ'লে, নেতাদের মধ্যে যথেষ্ট আত্মসংযম থাকা চাই। যুদ্ধের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হ'বে, কোটি কোটি টাকার চুক্তি (Contract) দিতে হ'বে। জনসাধারণের মনে যদি এ বিশ্বাস জন্মে যে, যুদ্ধের সুযোগে নেতারা বেশ দু'পয়সা ক'রে নিচ্ছেন, জাতীয় ধনের সাহায্যে নিজের উদরপূর্ত্তি করছেন, তা' হ'লে দেশময় অসন্তোষের সৃষ্টি হ'বে, যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'বে, দেশ শত্রুকবলিত হ'বে।

নেতাদের সম্বন্ধে যে কথা, শ্রমিকদের সম্বন্ধেও তাই। যুদ্ধের সাফল্য শ্রমিকদের দেশপ্রেম, ত্যাগ এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে; শ্রমিক যদি তার কর্ত্তব্য যথোচিতভাবে না করে, তা'হ'লে অজস্র অর্থব্যয় ক'রেও কোন ফল পাওয়া যাবে না। সময়-মত জিনিষ তৈয়ার হ'বে না। যা' তৈয়ার হ'বে তা' ঠিক কাজে লাগবে না। ধর্ম্মঘট প্রভৃতির আশঙ্কায় সমস্ত প্রচেষ্টা বিগদগ্রস্ত হ'য়ে পড়বে।

অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—নাগরিকদের নৈতিক স্বাস্থ্য এবং নৈতিক উৎকর্ষই হ'ল সুদৃঢ় রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি। প্রাচীন পারসিকেরা দুইটী জিনিষকে জাতীয় শিক্ষার আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন; যথা—সত্য বলা (to tell the truth) এবং ধনুক যোজনা করা (to pull the bow)। তাঁরা ভুল করেননি।

প্রশ্ন উঠে, জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষসাধন কি ক'রে করা যেতে পারে; এক কথায় শিক্ষা, অনুশীলন এবং জীবন্ত আদর্শের সাহায্যেই উহা সম্ভব। বাঙালী ব্যক্তি ও জাতি হিসাবে শক্তিমান্ ও সত্যনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পারে, যদি একান্ত আগ্রহসহকারে শুভবুদ্ধি নিয়ে আমরা বাঙালী সর্ব্বতোমুখী গঠনমূলক ব্রত গ্রহণ করি।

হিন্দু-মুসলমান

এদেশে প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ের বাস—হিন্দু এবং মুসলমান। এ কথা একান্তভাবে সুনিশ্চিত যে, বাংলার সুদিন ততদিন আসবে না, যতদিন এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে ভালবাসতে না শিখবে, আর উভয় সম্প্রদায়ের লোক নিজেদের প্রথমতঃ বাঙালী—আর তারপর হিন্দু কিম্বা মুসলমান হিসাবে ভাবতে না শিখবে। এই মঙ্গলপ্রসূ মানসিকতার সৃষ্টি কি ক'রে করা যেতে পারে, সেই হ'চ্ছে বাঙালীর সব চেয়ে বড় সমস্যা। এ সমস্যার আলোচনায় তিনটি প্রশ্ন এসে দেখা দেয়; আর তাদের উত্তরের উপর সমস্যার সমাধান নির্ভর করে। প্রশ্নগুলি হ'চ্ছে—(১) দুই সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান বিরোধের কারণ কি, (২) কি উপায় অবলম্বন করলে, সে বিরোধ দূরীভূত হ'তে পারে এবং (৩) কি উপায়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবিড় একত্ববোধের সৃষ্টি করা যেতে পারে?

বিরোধের কারণ কি, সেই প্রশ্নেরই প্রথমতঃ আলোচনা করা যাক। মানুষ কেন ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসে আর ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে? কেন সে সমাজবিশেষকে ভালবাসে আর সমাজবিশেষের প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে? একটু

ভেবে দেখলেই বুঝা যায়—আমাদের ভালবাসার কারণ হচ্ছে, যে সব জিনিষকে আমরা ভালবাসি, যে সব জিনিষ আমরা চাই, সেই সব জিনিষ ব্যক্তি এবং সমাজ-বিশেষের মধ্যে পাই বলেই তাদের আমরা ভালবাসি; পক্ষান্তরে বিরোধের কারণ হ'চ্ছে, যে সব জিনিষকে আমরা ভালবাসি—ব্যক্তি কিম্বা সমাজবিশেষ থেকে সে সব জিনিষের বিপদের কারণ আছে বলেই তাদের প্রতি আমরা বিরোধের ভাব পোষণ করি। আর যখন ব্যক্তি কিম্বা সমাজবিশেষ থেকে আমাদের প্রিয় জিনিষের সুবিধার কিম্বা বিপদের কোনটিরই সম্ভাবনা থাকে না, তখন সেই ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতি আমরা ঔদাসীন্যের ভাব পোষণ করি। প্রাতিবেশিক সমাবেশের দরুণ হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের জীবন এমনই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে, হয় তারা পরস্পরের জীবনকে সুভাবে প্রভাবান্বিত করবে, নয় কুভাবে প্রভাবান্বিত করবে; এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। সুতরাং হয় তারা পরস্পরকে ভালবাসবে, নয় ঘৃণা করবে; বাংলাদেশে ঔদাসীন্যের ভাব পরস্পরের প্রতি পোষণ করার মত এমন আবেষ্টনীর মধ্যে হিন্দু মুসলমান ঠিক বসবাস করে না।

আপাততঃ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা অর্থাৎ বিরোধের ভাবটাই যেন প্রবল। তার কারণ কি? আমার মনে হয় নিম্নলিখিত কারণগুলিই বর্ত্তমান বিরোধের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী, যথা—(১) ঐতিহাসিক শিক্ষার বর্ত্তমান প্রণালী, (২) ধর্ম্মগুরুদের অবাঞ্ছনীয় প্রভাব, (৩) সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সাহিত্যের প্রভাব, (৪) চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, (৫) বর্ত্তমান রাজনীতিক জীবনে এই চাকুরী-জীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য, (৬) অতীতের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রকে ফিরিয়ে আনবার দুরাশা এবং দুঃস্বপ্ন, (৭) বিভিন্ন ধরণের জীবনধারণ-প্রণালী, (৮) সম্মিলিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদির অভাব, (৯) ভবিষ্যতের

বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ব্যাপকতর সমবায়িক আদর্শের অভাব এবং (১০) বাঙালীর বর্ত্তমান জীবনে অবাঙালীর অতিরিক্ত প্রভাব।

ছেলেবেলা থেকে আমরা প'ড়ে আসছি, সুলতান মাহ্‌মুদ ভারত আক্রমণ ক'রে হিন্দুদের অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, মন্দিরের বিগ্রহাদিকে ধূলিসাৎ করেছিলেন, পুরোহিতদের লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত করেছিলেন, সাধারণকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করেছিলেন। আমরা আরও পড়ি, সুলতান আলাউদ্দীন কেমন ক'রে রাণী পদ্মিনীর লোভে রিপুপরবশ হ'য়ে চিতোর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। ইহারই পাশে চিত্রিত হয়েছে—চিতোরের বীর যোদ্ধারা অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে রণ-ক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন করেছিলেন, চিতোরের কুলললনারা রাণী পদ্মিনীর নেতৃত্বে প্রজ্জ্বলিত চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। তারপর আমাদের পড়ান হয় আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামির কথা। তাঁর গোঁড়ামির ফলে কি ভাবে মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল, মহারাষ্ট্রবীরেরা কি ভাবে শিবাজীর নেতৃত্বে হিন্দুসাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, শিখেরা মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিনায়কত্বে কি ভাবে হিন্দুরাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারপর আমরা বাংলার শেষ নওয়াব হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার অত্যাচার এবং স্বৈরাচারের বিষয়ে কত কি পড়ি! এই সব অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক, অর্দ্ধ-কাল্পনিক বিষয় এমন ভাবে লিখিত হয়েছে, এমনভাবে এ সবের শিক্ষা দেওয়া হয় যে, হিন্দু ছেলেদের মনে মোস্‌লেম-বিদ্বেষ আপনা থেকেই জেগে ওঠে। আর বাল্যজীবনের শিক্ষা এমন গভীরভাবে ছাত্রের অন্তরে প্রবেশ করে যে, পরে তার বিষময় প্রভাব থেকে তার মনকে শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুক্ত করা যায় না।

দেশে যদি নূতন আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি আমরা করতে চাই, হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিকে যদি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাই,

তা' হ'লে বিদ্যালয়ের পাঠ্য ঐতিহাসিক পুস্তকাদির আমূল পরিবর্ত্তন করতে হ'বে, ইতিহাসশিক্ষার প্রণালীও বদলে দিতে হ'বে। ইতিহাসের লেখক এবং শিক্ষকদের একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হ'বে যে, অন্যায় এবং অত্যাচার মুসলমানেরও একচেটিয়া জিনিষ নয়, আর হিন্দুরও একচেটিয়া জিনিষ নয়। দু'-একজন মুসলমান বাদশা যদি প্রজাপীড়ন ক'রে থাকেন, তাঁরা মুসলমান হিসাবে তা' করেন নি, তাঁদের স্বভাবেরই অনুসরণ করেছেন। তাঁদের স্বৈরাচারের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম্মের এবং মুসলমান জাতির কোন সম্পর্ক নাই। পক্ষান্তরে অসংখ্য মুসলমান বাদশা, নওয়াব, সুবেদার প্রভৃতি ন্যায়বিচার এবং উদারতার যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ এবং দৃষ্টান্ত তো ভারতবর্ষের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। দু'-একজন অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার চেয়ে অসংখ্য মহানুভব শাসনকর্ত্তাদের মহানুভবতার কথা স্মরণ করাই ভাল।

ইতিহাসের লেখক এবং শিক্ষকদের ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের সর্ব্বদা এ কথা মনে রাখা দরকার যে, এ দেশে হিন্দু-মুসলমানকে এক সঙ্গে বাস করতে হ'বে ; সুতরাং অতীতের সেই সব ঘটনা, জীবনী প্রভৃতির আলোচনার দরকার—যা' থেকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্নেহ-প্রীতি এবং ঐক্যের ভাব বৃদ্ধি পায়। আর যে সব ঘটনার আলোচনা পুরাতন ক্ষতকে নূতন ক'রে জাগিয়ে দেয়, সে সবের যত কম এবং সন্তর্পণে উল্লেখ হয়, ততই মঙ্গল। যেখানে সে সবের উল্লেখ অপরিহার্য্য, সেখানে নিরপেক্ষভাবে যাতে ঘটনাবলীর আলোচনা হয়, কোন বিশেষ জাতিকে দোষী না ক'রে যাতে প্রকৃত অপরাধীর উপরই দোষারোপ করা হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অন্যায় এবং অত্যাচার কোন বিশেষ জাতির কিম্বা সমাজের বিশেষত্ব

নয়, বরং সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই এবং সর্ব্বসমাজেই এরূপ হয়ে থাকে। তার প্রতিকার—জাতিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষের ভাব জাগিয়ে তোলায় নয়, পক্ষান্তরে তার প্রতিকার হ'চ্ছে, যে অজ্ঞতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার দরুণ সেই সব অন্যায় এবং অত্যাচার সম্ভব হয়েছে, সেই অজ্ঞতা এবং স্বেচ্ছাচারিতাকে সমাজজীবন থেকে বিদূরিত করা। এই সব বাস্তব মূল্যবান্ নীতি সম্মুখে রেখেই ঐতিহাসিকদের ইতিহাস রচনা করার দরকার; যাঁরা পাঠ্য নির্ব্বাচন কিম্বা প্রকাশ করেন, তাঁদের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—এই সব নীতি অনুসৃত হয়েছে কি না, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থ নির্ব্বাচন এবং প্রকাশ করা। শিক্ষকদেরও এ বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব আছে। ইতিহাস পড়াবার সময়ে তাঁদের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে, ছাত্রদের এই সব সত্যের বিষয়ে অবহিত করা, আর ইতিহাসের শিক্ষা যাতে তাদের মনে জাতিবিদ্বেষের বীজ বপন করতে না পারে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

ধর্ম্মব্যবসায়ী যাজক এবং পুরোহিত সমাজজীবনে অপরিহার্য্য। অথচ ধর্ম্ম নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁদের মধ্যে সর্ব্বত্রই ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদের, এমন কি সমধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি অনুদার ভাব এবং তাদের মানসিকতা বোঝবার ধৈর্য্য এবং ক্ষমতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অনুদারতা, অসহিষ্ণুতা এবং অজ্ঞতা কেবল ভারতীয় যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু ইহা সর্ব্বদেশেই কমবেশী বিদ্যমান। পুরোহিত এবং ধর্ম্মযাজকদের এই মানসিকতা সমাজজীবনে অশেষ অকল্যাণের সৃষ্টি করে। আর সেই জন্যই দেখতে পাই—যেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় জীবনকে জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা দিবার চেষ্টা করেছে, সেইখানেই পুরোহিতদের তরফ থেকে প্রচণ্ড বাধা এসে দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রসংস্কারকদের তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরোহিতদের কঠোরভাবে দমন করতে হয়েছে।

(ফরাসী বিপ্লব থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের যুগের তুর্কী-বিপ্লব পর্য্যন্ত সেই একই সত্যের পুনরভিনয় হয়েছে। যাঁরা বঙ্গদেশে জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, যাঁরা ভাবী নব্য বাংলার রূপকার, এক কথায় যাঁরা দেশে নূতন কিছু করতে চান, তাঁদেরই যাজক সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড বিরোধিতার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'বে। এই সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কখনও তাঁরা আশা করতে পারেন না।

পুরোহিতেরা মানুষের অজ্ঞতাকে অবলম্বন ক'রে চিরকাল স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা ক'রে এসেছেন। অজ্ঞ অসহায় নরনারীর উপরই তাঁদের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রভাবের তাঁরা অপব্যবহারই করেছেন। তাঁদের প্রভাবকে সংযত করতে হ'লে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা যাতে সাধারণের মধ্যে সম্যক্ বিস্তার হয়, তার জন্য আমাদের সচেষ্ট হ'তে হ'বে। কেবল বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করলে চলবে না। সাময়িক এবং সাধারণ সাহিত্যের সাহায্যে সে শিক্ষাকে জনসাধারণের মধ্যে পৌছে দিতে হ'বে। বক্তৃতার সাহায্যে সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও প্রভৃতির সাহায্যে সে শিক্ষাকে প্রচার করতে হ'বে। আর সেই শিক্ষার সাহায্যে সাধারণের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা, পরধর্ম্মের প্রতি, ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সৃষ্টি করতে হ'বে। সেই শিক্ষার সাহায্যে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে হ'বে। আর সেই শিক্ষার সাহায্যে তাদের মধ্যে আর্ত্ত মানবের প্রতি প্রীতি এবং সমবেদনার ভাবকে সঞ্চারিত করতে হ'বে।)

• ইংরেজ রাজত্বের সূচনার যুগেই আধুনিক বাংলা সাহিত্য জন্ম লাভ করে। ইংরেজের প্রভাব তখন বাঙালীর জীবনে এবং মানসক্ষেত্রে অপ্রতিহত। বিশেষভাবে প্রগতিশীল বাঙালী হিন্দু ইংরেজী সভ্যতাকে

তখন আদর্শ বলেই মেনে নিয়েছিল, আর ইংরেজের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাকে শিক্ষার আদর্শ পন্থা বলেই গ্রহণ করেছিল। তাই ইংরেজের রচিত ইতিহাসকে বেদবাক্যের মতই অকাট্য ব'লে তাদের মেনে নিতে সে-সময়ে কোন সংশয়ই জাগেনি। ইংরেজ মুসলমানদের কাছ থেকে সবেমাত্র ভারতবর্ষ দখলে এনেছে। এজন্য স্বভাবতই তারা মুসলমানদের প্রতি এবং তাদের ধর্ম্ম ইসলামের প্রতি বৈর-ভাব পোষণ করত। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং স্বকার্য্যের সমর্থনের জন্য মুসলমান জাতি এবং ইসলাম ধর্ম্মকে মসীবর্ণে চিত্রিত করতে তখনকার যুগে তারা কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করত না। তাদেরই লেখা প'ড়ে বাঙ্গালী হিন্দুর মনে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা এবং অবজ্ঞার ভাব স্বতঃই জেগে উঠা স্বাভাবিক, আর সে ভাব প্রকাশ পেয়েছিল তাদেরই সৃষ্ট তখনকার বাংলা সাহিত্যে। সে যুগের বাংলা সাহিত্যের অনেকখানি তাই মোসলেম-বিদ্বেষে ভারাক্রান্ত। সে সাহিত্য হিন্দু-মোসলেম বিরোধ জাগিয়ে রাখতে বিশেষভাবে কার্য্যকরী হয়েছে।

তখনকার যুগের ভারতীয়েরা আমলাতন্ত্রমূলক ইংরেজ-শাসনকে চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারকার মতই চিরস্থায়ী নিসর্গের অন্তর্গত ব'লে মনে করত, আর সেই শাসনের অধীনে হিন্দু-মুসলমানের নিবিড় মিলনের তারা বিশেষ কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি; তাই তাদের সৃষ্ট সাহিত্যে সে মিলনের কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য তখনকার যুগের কোন কোন কবি স্বাধীনতার বিষয়ে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের সেই সব রচনাকে নিছক ভাবানুশীলনের উর্দ্ধে স্থান দেওয়া যায় না। স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণশীল ভারতবর্ষের কোন সুস্পষ্ট ছবি বা পরিকল্পনা তাঁদের মনে ছিল না এবং থাকাটাও স্বাভাবিক নয়। টড প্রভৃতি একদেশদর্শী ঐতিহাসিকদের

গল্পমূলক রচনা প'ড়ে কবির স্বভাবসুলভ ভাবের আতিশয্যে কাল্পনিক এক স্বর্ণযুগের সুখস্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন মাত্র।

এখন হিন্দু-মুসলমানের নিবিড় মিলনের প্রয়োজন আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। এখন প্রত্যেক প্রকৃতিস্থ বাঙালী বোঝেন, হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক মিলন না হ'লে, এদেশ রসাতলে যাবে, বাঙালী নিজ দেশে পথের ভিখারী হ'বে। সুতরাং এখন আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে সম্পূর্ণ নূতন একটা রূপ দিতে হ'বে। হিন্দু-বিদ্বেষ এবং মুসলমান-বিদ্বেষ যাতে সাহিত্যে তিলমাত্র স্থান না পায়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হ'বে। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি এবং ঐক্যানুভূতি যাতে সাহিত্যে সম্যক্‌ভাবে ফুটে ওঠে, তার জন্য চেষ্টা এবং সাধনা করতে হ'বে। আর বাংলার জাতীয়তার আদর্শ যাতে সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে সুনিয়ন্ত্রিত ধারাবাহিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হ'বে।

এযুগে সাময়িক-সাহিত্যের প্রভাব খুব বেশী। দু'-একটি দৈনিক এবং মাসিক পত্রিকা যেখানে যায় না, এমন একটি পল্লীগ্রাম খুঁজে পাওয়া কঠিন। দুঃখের বিষয়, এই পত্রিকাসমূহের অধিকাংশ পরিচালকদের মধ্যে আদর্শের এবং দায়িত্বজ্ঞানের অভাব একান্তভাবেই পরিদৃষ্ট হয়। তাঁদের অসংযত লেখা সাম্প্রদায়িকতার মারাত্মক বিষ প্রত্যহ দেশময় ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ অবশ্য লাভের ব্যবসা, তা' না হ'লে এমন অপকর্ম্ম এত আগ্রহের সঙ্গে তাঁরা কেন করতে যাবেন? যাঁরা বাংলার সত্যকার মঙ্গল চান, আশা করি, তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই ব্যাধির প্রতিকারে আত্মনিয়োগ করবেন। যাঁরা মিথ্যার প্রচার ক'রে লাভবান্ হচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সত্যের প্রচার ক'রে তাঁদের লাভের বন্যায় ভাঁটা আনতে হ'বে। এ সব লোক ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর কিছু

বোঝে না। বলা বাহুল্য, আর্থিক সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখলেই এঁরা নূতন স্বরে গাইতে আরম্ভ করবেন। এঁদেরই লেখা তখন আমাদের উদ্দেশ্যকে সার্থকতার পথে আগিয়ে দেবে।

ভারতের তথা বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রথম রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা আরম্ভ করেন এবং রাজনৈতিক সংস্কার এবং পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যেই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবেশ লাভ করে—আর তারই প্রভাবে প'ড়ে তাঁরা ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনকে নূতন রূপ দেবার চেষ্টা করেন। বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা অধিকাংশই হয় চাকুরীজীবী, নয়তো কোন না কোন প্রকারে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলন প্রথমতঃ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবিদের অর্থনৈতিক স্বার্থের আলোচনাকেই প্রাধান্য দিতে থাকে। বর্ত্তমানে অবশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন অনেকটা জনসাধারণের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে। বর্ত্তমানেও কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা এবং কর্ম্মীদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। সুতরাং স্বভাবতই শ্রেণীগত স্বার্থই তাঁদের চক্ষে সব চেয়ে গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যারূপে দেখা দেয়। আর তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর একদেশদর্শিতার ফলে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে চাকুরীর ভাগবাঁটোয়ারাই সব সমস্যাকে কোণঠাসা ক'রে দেশের রাজনীতিকে তিক্ত এবং বিষাক্ত ক'রে তুলেছে। কেন না, চাকুরীর সংখ্যার একটা সীমা আছে। পক্ষান্তরে, উমেদারদের সংখ্যার কোন সীমা-পরিসীমা নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উমেদারদের মধ্যে চাকুরীর বিভাগবণ্টন নিয়ে কাড়াকাড়ি-ছেঁড়াছিঁড়ি হয়। উমেদারদের রাজনীতিক সমর্থকেরা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই কাড়াকাড়ি-ছেঁড়াছিঁড়িকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়ে তাকে জটিল এক জাতীয় সমস্যায় পরিণত

ক'রে থাকেন। কলহ-কোন্দলের তাড়নায় প্রকৃত জাতীয় স্বার্থের কথা, দেশের প্রকৃত সমস্যাসমূহের কথা সকলে ভুলে যান। চাকুরীসমস্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল ও মীমাংসার অতীত এক সমস্যারূপে দেখা দেয়! কাজেই, প্রকৃত রাজনীতি ব্যাহত হয়; প্রকৃত রাজনৈতিক সমস্যার কথা সকলে ভুলে যায়।) এর প্রতিকার কি?

অবশ্য যাঁরা দৈনন্দিন রাজনীতি নিয়ে আছেন, তাঁরা এ সমস্যার মীমাংসা ভাগ-বাঁটোয়ারার সাময়িক একটা হার নির্দ্দিষ্ট ক'রে কতক পরিমাণে করতে পারেন। কিন্তু এভাবে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হ'তে পারে না। কেন না, শিক্ষার হার, শিক্ষিতের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয় নিত্য পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং দাবীর পরিবর্ত্তন রোজই হ'তে থাকবে আর তাই নিয়ে নূতন কলহের, নিত্য নূতন তিক্ততার সূত্রপাত হ'বে। তবে উপায় কি?

প্রথম উপায় হ'চ্ছে, রাজনৈতিক আলোচনাকে এত ব্যাপক ক'রে তোলা যে, তার ফলে স্বাভাবিক ভাবে অর্থনৈতিক গণস্বার্থই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান বিষয় হ'য়ে দাঁড়াবে। দেশের লোকের মন যখন সত্যই এই বিরাট্ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীসমস্যা স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় জীবনের অন্যতম তুচ্ছতর ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে। সে সমস্যা তখন দেশের লোককে লক্ষ্যভ্রষ্ট কিম্বা আদর্শভ্রষ্ট করতে পারবে না। তবে এ পরিস্থিতি-সৃষ্টির জন্য দেশব্যাপী শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন এবং শিক্ষার সাহায্যে সাধারণের মনকে রাষ্ট্রীয় সমস্যার দিকে সম্যক্‌ভাবে আকৃষ্ট করারও দরকার। এ কাজ হিন্দুদের মধ্যে কতকটা অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মোটেই হয় নি। তাই মুসলমানদের মধ্যে হাতুড়ে রাজনীতিকদের প্রভাব এত বেশী।

মুসলমানের শিক্ষার দৈন্য এবং রাজনীতিক চেতনার অভাব আজ সমস্ত দেশকে বিপন্ন ক'রে তুলছে। শিক্ষার দৈন্য থেকেই আসে রাজনৈতিক চেতনার অভাব। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে যাতে শিক্ষার বিস্তার—আধুনিক শিক্ষার বিস্তার যতদূর সম্ভব দ্রুত হয়, তার জন্য প্রত্যেক দেশপ্রেমিকেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। এ বিষয়ে হিন্দুরা অনেক কিছু করতে পারেন। তাঁরা যদি নিস্বার্থভাবে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করেন, মুসলমানদের বর্ত্তমান যুগের উপযোগী আদর্শে অনুপ্রাণিত করার সাধনায় সুসম্বদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ করেন, মাতৃভাষার প্রতি তাদের মনে ভালবাসার ভাব জাগিয়ে তোলবার কাজে ব্রতী হ'ন, তা'হ'লে তাঁদের সেই মঙ্গলপ্রচেষ্টা থেকে অদূর ভবিষ্যতে আশাতীত ফল পাওয়া যেতে পারে। ইংরেজ মিশনারীরা এইভাবেই বাংলাদেশে এক শতাব্দী পূর্ব্বে আধুনিক জীবনধারার প্রবর্ত্তন করেছিলেন ফরাসী এবং আমেরিকার মিশনারীরা এই ভাবেই উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক সাম্রাজ্যে আধুনিক জীবনের সূত্রপাত করেছিলেন। বাংলা দেশে এ কাজ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ব'লেই আমার মনে হয়; মুসলমানদের বিশিষ্ট এক দল নিশ্চয় এ বিষয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে হিন্দুদের সহযোগিতা করবে 'র মঙ্গলসাধনায় উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ভবিষ্যতের রাজনীতির জন্য সুদৃঢ় এক ভিত্তি রচনা করবে।

এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যাদের মন স্বভাবতই সঙ্কীর্ণতার দিকে যায়, উদারতার দিকে যায় না। তারা নিজের গ্রামের বিষয়ে এত পক্ষপাতিত্ব করে যে, ভিন্ন গ্রামের লোকের সঙ্গে তাদের কলহ উপস্থিত হয়; নিজের শ্রেণীর প্রতি এত পক্ষপাতিত্ব করে যে, ভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাদের বিবাদ বেধে ওঠে। এইভাবে তারা শ্রেণীগত স্বার্থ নিয়ে

সর্ব্বদাই বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে কলহে রত থাকে। এই শ্রেণীর লোক তাদের মনের ক্ষুদ্রতা এবং স্বার্থপরতাকে সাম্প্রদায়িক আকার দিয়ে দেশের ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে কলহ করে, আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীর লোকই হিন্দু-মুসলমানবিরোধের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে আর মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে। উভয় স্বপ্নই যে আকাশ-কুসুমের মত অলীক, সে কথা তারা বোঝে না, বুঝতে চায় না এবং বোঝাবার শক্তিও তারা হারিয়ে ফেলেছে। অজ্ঞ জনসাধারণ তাদের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে; আর তার ফলস্বরূপ দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আর কলহ, মারামারি, কাটাকাটি আর খুনোখুনি!

সাহিত্যিকের কাজ হ'চ্ছে—উদার সার্ব্বজনীন মনোভাবের সৃষ্টি করা। সাধনার সাহায্যে নিজেদের মধ্যে উদার মনোভাবের সৃষ্টি করতে হ'বে, আর সেই উদার মনোভাব সাহিত্যে প্রকাশ করতে হ'বে। তাঁরা যদি তা' করতে পারেন, তা' হ'লে তাঁদের সাহিত্যসাধনা সার্থক হ'বে; আর তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের সাহায্যে তাঁরা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করতে পারবেন। তবে একথা মনে রাখতে হ'বে যে, কেবল কথার উদারতায় প্রকৃত কাজ হ'বে না; মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রাতে, অভ্যাস-অনুশীলনে সেই উদারতা দেখাতে হ'বে। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষদের সম্মান করতে হ'বে, তাঁদের আদর্শের, তাঁদের সাধনাকে শ্রদ্ধা দেখাতে হ'বে, তাঁদের জীবনে এবং সাধনায় যা' কিছু প্রশংসার্হ মুক্তকণ্ঠে সে সব স্বীকার করতে হ'বে। তারপর পর-ধর্ম্মের প্রতি, ভিন্ন জাতির প্রতি অসংযত আক্রমণ যাতে বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হয়, তার জন্য দেশব্যাপী আলোচনা ও আন্দোলন চালাতে হ'বে। আর যাঁরা এই সব

গর্হিত আচরণ করে, তারা যাতে কোন সমাজে প্রশ্রয় না পায়, তার জন্য সচেষ্ট থাকতে হ'বে। আর তাদের মতবাদের অসারতা সুযুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে হ'বে। তারপর দৃষ্টান্ত এবং প্রচারকার্য্যের দ্বারা উচ্চতর আদর্শের গৌরব দেশময় ঘোষণা করতে হ'বে। উচ্চতর আদর্শ সত্যই যদি একবার মাথা তুলে দাঁড়ায়, তা'হ'লে নীচতাকে পরাভব স্বীকার করতেই হ'বে। আকাশে সূর্য্যোদয় হ'লে অন্ধকার কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে? উচ্চতর আদর্শ মাথা তুলে দাঁড়ায়নি বলেই নীচতার এতটা আস্ফালন! আমাদের সমস্ত চেষ্টা এবং সাধনাকে এই উচ্চতর আদর্শের প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োগ করতে হ'বে। সাফল্য আসতে বিলম্ব হ'তে পারে বটে, কিন্তু সাফল্য সুনিশ্চিত। প্রয়োজন কেবল ধৈর্য্যের এবং ঐকান্তিক সাধনার।

যা' অপরিচিত, তাকেই মানুষ ভয় করে, সন্দেহের চক্ষে দেখে। আর যা' পরিচিত, যত কুৎসিৎ এবং অবাঞ্ছনীয়ই হোক, তাকে গ্রহণ করতে, তাকে নিয়ে ঘর করতে মানুষ দ্বিধাবোধ করে না। হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ হ'চ্ছে, তাদের সামাজিক মিলনের বিরলতা, তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধরণের জীবনধারণপ্রণালী, তাদের বিভিন্ন রীতিনীতি। সুখের বিষয় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার প্রভাবে এই বিভিন্নতা, এই দূরত্ব ক্রমেই ক'মে আসছে, বিশেষ ক'রে এই বাংলা দেশে। তিরিশ-চব্বিশ বৎসর পুর্ব্বে কে হিন্দু আর কে মুসলমান, তা' তাদের দেখলেই চেনা যেত—তাদের কথা শুনলেই বোঝা যেত; আর তাদের আচার-ব্যবহার অতি স্পষ্টভাবেই তা' ঘোষণা করত। কিন্তু এখনকার বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের বিষয়ে সে কথা বলা চলে না। তখনকার দিনে হিন্দুমুসলমানের এক সঙ্গে ব'সে আহার-বিহার করা অভাবনীয় ব্যাপার বলেই মনে হ'ত। এখন কিন্তু তা' নিত্যই ঘটছে।

এইভাবে উভয় সম্প্রদায়ের আচার এবং সংস্কারগত বৈষম্য ক্রমেই কমে আসছে। যুগ-ধর্ম্মের প্রভাবে এবং প্রকৃতির তাড়নাতেই এই পরিবর্ত্তন ঘটে যাচ্ছে। আমরা যদি এখন মিলনের আদর্শ সম্মুখে রেখে, সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে যুগধর্ম্মের সাহায্য এবং সমর্থন করি, তা'হ'লে সম্প্রদায়গত দূরত্ব আরও দ্রুত কমে যাবে, আর ঐক্যের বন্ধন ক্রমেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হ'তে থাকবে।

প্রাচীন হিন্দু এবং মুসলমান সমাজ ধর্ম্মের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল; আর তাই সমধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য এবং প্রীতির বন্ধন যাতে দৃঢ় হয়, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই বিভিন্ন প্রকারের উৎসব, অনুষ্ঠান, পূজা-পার্ব্বণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন আমরা আমাদের জীবনকে রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে গড়তে চাই। সুতরাং তার উপযোগী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদির সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগের অন্যতম রাষ্ট্রনেতার সারগর্ভ বাক্য এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিখ্যাত লেখক এমিল লাডউইক রাষ্ট্রনেতাকে জিজ্ঞাসা করেন,

"Do you think there is any notable difference between the composition of a modern revolutionist and that of the early days ?"

জবাবে রাষ্ট্রনায়ক বলেন:

"Tho form has changed. One condition, however, has been requisite through all the ages—courage, physical as well as moral. For the rest, every revolution creates new forms, new myths, new rites; and the would-be revolutionist, while using old traditions, must refashion them. He must create new festivals, new gestures, new forms which will themselves in turn become traditional. The aerplane festival is new today. In half a century it will be encrusted with the patina of tradition.."

মানুষকে যেমন ভাষার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়, প্রত্যেক আদর্শকে তেমনি আত্মপ্রকাশ করতে হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, উৎসব, সম্মেলন প্রভৃতি অভিজ্ঞানের (symbol) সাহায্যে।

জাতীয়তার আদর্শকে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে, এদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করতে হ'বে। আর আমাদের সাধনাকে সার্থক করতে হ'লে, আমাদের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে, আমাদের ভুলে যেতে হ'বে আমরা হিন্দু কি মুসলমান, আর্য্য কি অনার্য্য। এখন পর্য্যন্ত যে এ জাতীয়তার আদর্শ এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে, যাঁরা বাহ্যতঃ এ আদর্শের অনুসরণ করেন, তাঁদের অনেকেই বস্তুতঃ এ আদর্শের আড়ালে ধর্ম্ম কিম্বা গোষ্ঠীমূলক আদর্শ প্রচার করতে চেষ্টা করেন। ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নাই, গোষ্ঠীর সঙ্গেও আমাদের বিবাদ নাই। তবে ভণ্ডামির সঙ্গে সত্যই আমাদের বিবাদ আছে। যখন ধর্ম্মমূলক আদর্শের অনুসরণ করি, তখন ধর্ম্মের দিক থেকেই কথা বলার দরকার। যখন গোষ্ঠীর আদর্শের অনুসরণ করি, তখন গোষ্ঠীর দিক্ থেকেই কথা বলার দরকার। আর যখন জাতীয়তার আদর্শের অনুসরণ করি, তখন নিছক জাতীয়তার দিক্ থেকেই কথা বলার দরকার। অন্যথায় ব্যর্থতা অনিবার্য্য।

সর্ব্ব ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শ দিয়ে বিচার করলে, যে স্বনামধন্য মহাপুরুষের নাম সর্ব্বাগ্রে মনে আসে, তিনি হচ্ছেন মোগল সম্রাট্ জালালুদ্দীন আকবর। হিন্দু, মোসলেম, খৃষ্টান, পারসিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীর সম্মিলিত জাতীয়তার বিরাট্ স্বপ্ন তিনিই সর্ব্বপ্রথম দেখেছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তার তিনিই হলেন সত্যকার আদি স্রষ্টা। আমার মনে হয়, তাঁর সেই স্বর্গীয় স্বপ্নকে ভারতবাসীর মনে চিরতরে জাগিয়ে রাখবার জন্য বৎসরের একটি দিনকে অন্ততঃ তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা আমাদের কর্ত্তব্য। দেশময় সেদিন আনন্দোৎসব হওয়া উচিত; রাত্রে প্রত্যেক গৃহকে, প্রত্যেক রাজপথকে আলোকমালায় সজ্জিত করা কর্ত্তব্য; সঙ্গীতে, নৃত্যে, আতসবাজীর ঐন্দ্রজালিক মায়ার

সাহায্যে সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করা বাঞ্ছনীয়।

বাংলার জাতীয়তার কথা ভাবতে গেলে, প্রথম যে মহাপুরুষের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে, তিনি হলেন শহীদ নওয়াব সিরাজদ্দৌলা। আনন্দ এবং আশার বিষয় এই যে, তাঁর স্মৃতিরক্ষার বিষয়ে বাঙালী এখন যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছে এবং যথাসম্ভব তৎপরতা দেখাচ্ছে।

বর্ত্তমান যুগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ অনেক পুণ্যস্মরণীয় বাঙালী নেতা অখণ্ড জাতীয়তার স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন। এঁরা সত্যই খাঁটি বাঙালী। তাঁদেরও স্মৃতি-উৎসব সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

বৎসরের প্রথম দিনকে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক জাতিই সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে থাকে। দিল্লীর মোগল বাদশাহেরা প্রাচীন ইরানের নওরোজ পর্ব্ব কত ধূমধামের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। আমার মনে হয়, এই বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে ১লা বৈশাখে সকলেই মহাসমারোহের সহিত জাতীয় পর্ব্বরূপে নববর্ষের উৎসব সম্পন্ন করা উচিত। আর এই পর্ব্বকে উপলক্ষ্য ক'রে সমগ্র জাতির সেদিন পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেলামেশা করা কর্ত্তব্য। বক্ষ্যমান আলোচনায় এর অধিক কিছু বলা কম্বা দৃষ্টান্তের সংখ্যা বাড়ান সম্ভব নয়। জাতীয় আদর্শ সত্যই যদি কাম্য হয়, তা'হ'লে সে আদর্শের প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠার উপযোগী উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির প্রবর্ত্তন অনিবার্য্য হবেই। এই সত্যটি মনে রেখে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করতে হ'বে। আদর্শের প্রতি সত্যই যদি আমাদের নিষ্ঠা থাকে, ক্রিয়া-কর্ম্ম নিরূপণ করতে বেগ পেতে হ'বে না।

বার্ণাড শ চিন্তাকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—মৃত বা প্রাণহীন চিন্তা (dead thoughts) এবং জীবন্ত চিন্তা (living)

thoughts)। ভাষার মধ্যে যেমন জীবন্ত এবং মৃত ভাষা আছে—চিন্তার মধ্যে, আদর্শের মধ্যেও তেমনি জীবন্ত চিন্তা, জীবন্ত আদর্শ এবং মৃত চিন্তা, মৃত আদর্শও আছে। মৃত ভাষায় কেউ কথা বলে না, কিন্তু মৃত চিন্তাকে নিয়ে অনেক ভাবুককেই ভাবের চর্চ্চা করতে দেখি; মৃত আদর্শকে নিয়ে অনেক তথাকথিত আদর্শবাদীকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখি। কিন্তু মৃত ভাষায় যেমন প্রাণের সঞ্চার করা যায় না, তেমনি মৃত ভাবের মধ্যে, মৃত আদর্শের মধ্যেও প্রাণের সঞ্চার করা যায় না। গালিভারের ট্রাভল্স্-এ আছে যে, বামনদের রাজ্যে, লিলিপুট দেশে ডিম্বের সরু দিক্ থেকে ভাঙ্গা উচিত, কি চওড়া দিক্ থেকে ভাঙ্গা উচিত, তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্রের মত এক মহা যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। আমাদের কাছে ব্যাপারটি তুচ্ছ ব'লে মনে হয়; কিন্তু যারা এই নিয়ে ভীষণ সমরানলের সৃষ্টি করেছিল, তাদের কাছে বিষয়টি মোটেই তুচ্ছ ছিল না। সমস্যাটি তাদের কাছে জীবন্ত আকারে দেখা দিয়েছিল, আর আমাদের কাছে সেটি প্রাণহীন মৃত। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে বিলাতপ্রত্যাগত লোকদের সঙ্গে কোন সামাজিক সম্পর্ক রাখা উচিত কি না, তাই নিয়ে এক মহা আন্দোলন চলেছিল। এখন কিন্তু সে বিষয় নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করে না। বিষয়টী একদিন জীবন্ত সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছিল, আর এখন সেটি মৃত; তার মধ্যে প্রাণের সাড়া নাই। এই বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে নামাজের সময় "আমীন" শব্দ জোরে বলা উচিত কিম্বা মৃদুভাবে মনে-মনে বলা উচিত—তাই নিয়ে কত মারামারি, কাটাকাটি, এমন কি খুনোখুনি পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে। এখন কিন্তু সে নিয়ে কাউকে উচ্চবাচ্য করতে দেখি না। যে সমস্যা একদিন জীবন্ত প্রাণবন্ত সমস্যারূপে মানুষের মনে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করত, সে সমস্যা এখন প্রাণহীন, নিস্পন্দ, মৃত। তাকে নিয়ে মাথা

ঘামাবার এখন কেউ প্রয়োজন অনুভব করে না। এখন সেটি পরিত্যক্ত আদর্শের অন্তর্গত।

আমাদের দেশবাসীদের জড়তার প্রধান কারণ, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের প্রধান কারণ—আমাদের জীবনের তুচ্ছতার প্রধান কারণ—আমরা জীবন্ত চিন্তা এবং মৃত চিন্তার মধ্যে প্রভেদ করতে শিখিনি। কোন ভাব, কোন আদর্শটি সত্যই জীবন্ত, আর কোন ভাব, কোন আদর্শটী প্রকৃতপক্ষে মৃত, সে বিষয়ে স্থির-ধীর বুদ্ধির সাহায্যে ভাবতে শিখিনি। যেদিন সে ভাবে ভাবতে শিখব, সেদিন আমাদের ব্যর্থতারও শেষ হ'বে। আমাদের জীবনসাধনা সেদিন সত্যকার সার্থকতার পথে এসে পৌছবে। এ বিষয়ে প্রতিভাশালী সাহিত্যিকরা সত্যই দেশের যথেষ্ট উপকার করতে পারেন। মার্জ্জিতবুদ্ধি এবং ধারাল বিশ্লেষণ শক্তির সাহায্যে তাঁরা বুঝতে পারবেন কোন চিন্তা আর কোন আদর্শ বর্ত্তমান যুগে প্রাণহীন, অচল; কোন আদর্শ এবং চিন্তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন এখন পাওয়া যায়; তাঁদের নিপুণ লেখনীর সাহায্যে মৃত আদর্শের সংকারে আর জীবন্ত আদর্শের সম্প্রসারণে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবেন। বাংলাদেশে অনেক প্রতিভাশালী সাহিত্যিক আছেন—তাঁরা যদি এইভাবে এক একটি জীবন্ত আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে কিম্বা মৃত আদর্শের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করতে সচেষ্ট হ'ন, তা' হলে দেশ মঙ্গলের পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে। সত্য নিজগুণে এবং নিজ শক্তিতে মানুষের মনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। আমাদের প্রধান কাজ হ'চ্ছে সত্যকে মানুষের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা। বাকি কাজ সত্য নিজেই ক'রে যাবে।

বিদেশীর প্রভাব বাঙালীর জীবনে নিত্যই বেড়ে চলেছে, আর তার ফল মোটেই ভাল হ'চ্ছে না। বিদেশীর গোঁড়ামি বাঙালীর

জীবনে সংক্রামিত হ'চ্ছে, বিদেশীর পশ্চান্মুখিতা বাঙালীর জীবনে সংক্রামিত হ'চ্ছে, বিদেশীর সাম্প্রদায়িকতা বাঙালীর জীবনে সংক্রামিত হ'চ্ছে, আর বিদেশীর অতীতমুখী মানসিকতা বাঙালীর জীবনে সংক্রামিত হ'চ্ছে। বিদেশীর কুটিল প্রভাবে বাঙালী তার জাতীয় স্বার্থের কথা ভুলে যাচ্ছে, বিদেশীর প্রভাবে বাঙালী তার অতীতের কথা ভুলে যাচ্ছে, তার ভবিষ্যতের কথা ভুলে যাচ্ছে। বিদেশীর প্রভাবে বাঙালী তার আদর্শের কথা, তার কর্ত্তব্যের (mission) কথা ভুলে যাচ্ছে। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে এখন বাঙালীর প্রকৃত কাজ হ'চ্ছে, প্রকৃত কর্ত্তব্য হ'চ্ছে, বাঙালীত্বের জীবনদায়ী আদর্শকে সম্মুখে রেখে নিজদেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হওয়া; বিদেশীর বিষাক্ত প্রভাব থেকে মাতৃভুমিকে মুক্ত করা। আমার বিশ্বাস, এই হ'চ্ছে বর্ত্তমান যুগের বাঙালীর সব চেয়ে জীবন্ত আদর্শ, এই আদর্শের সাধনাই তাকে মঙ্গলের পথে, সার্থকতার পথে নিয়ে যাবে; এই আদর্শের কল্যাণ-স্পর্শ ই সাম্প্রদায়িকতার বিষ থেকে তার সমাজদেহকে মুক্ত করবে; এ আদর্শের সঞ্জীবনী সুধাই তাকে পূর্ণতর জীবনের সন্ধান দেবে। সব ছেড়ে এই আদর্শের সাধনাতে আত্মনিয়োগ করাই হ'ল ভবিষ্য-স্রষ্টা বাঙালীর জীবন-সাধনার প্রকৃষ্টতম পথ।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন

হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সমস্যা যেমনি জটিল, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের তথা বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ এই সমস্যার উচিত সমাধানের উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। অথচ আমাদের তথাকথিত নেতারা এ সমস্যার গুরুত্ব সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করেন না, আর এ সমস্যা সমাধানের উপায় যে কি, সে বিষয়েও কোন ফলপ্রসূ নির্দ্দেশ দেন নি। সুতরাং শিক্ষিত জনসাধারণকেই এ সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হ'তে হ'বে।

আমার মনে হয়, এ সমস্যার সমাধান যতদিন সমাজ, কৃষ্টি এবং সাহিত্যের তরফ থেকে না হ'বে, ততদিন রাজনীতির দিক্ থেকেও হ'বে না। কেন না, রাজনীতি হ'ল বাইরের জিনিষ, আর সামাজিক জীবন, কৃষ্টি এবং সাহিত্য, এ সব হ'ল জাতির অন্তরের জিনিষ। অন্তরের মিল না থাকলে, বাইরের চুণকাম করা মিলের কোন মূল্য নাই। সামান্য ঝড়-বৃষ্টিতেই সে ভূয়া ইমারত ভূমিসাৎ হ'বে।

ভিতরের মিল কি ক'রে আনা যেতে পারে, এখন তারই আলোচনা করা যাক। আমার মনে হয়, ভিতরের মিল মনের মিল ছাড়া হ'তে পারে না। হিন্দু-মুসলমান যখন পরস্পরকে চিনতে শিখবে, পরস্পরকে ভালবাসতে শিখবে, পরস্পরের ধর্ম্ম এবং সভ্যতাকে সম্মান এবং আদর করতে শিখবে,. পরস্পরের সঙ্গে খাওয়া-বসা, খেলা-ধূলা, মেলা-মেশা আনন্দ-উৎসব করতে শিখবে, মনের মিল তখন আপনা থেকেই আসবে, বিরোধ আপনা থেকেই চলে যাবে।

এই অন্তরের মিলনের ভিত্তিই হ'চ্ছে ভাষা এবং সাহিত্য। ভাষার ঐক্য ছাড়া, সাহিত্যের ঐক্য ছাড়া মানুষের মধ্যে সেই প্রগাঢ় হৃদ্যতা আসতে পারে না, যার উপর ভিত্তি ক'রে একটা সুসম্বদ্ধ জাতি গড়া যেতে পারে, আর সেই হৃদ্যতা সমগ্র ভারতের মধ্যে নাই বলেই রাষ্ট্রের দিক্ থেকে আমাদের জাতিগড়নের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এর প্রতিকার কি ?

আমার মনে হয় ভারতীয় জাতীয়তাকে প্রাদেশিক জাতীয়তার ভিত্তির উপরই গড়তে হ'বে। প্রত্যেক প্রদেশের ভাষাকে অবলম্বন ক'রে সেই প্রদেশের হিন্দু এবং মুসলমানকে একতার সুনিবিড় সূত্রে গ্রথিত করতে হ'বে। প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান যথাসময়ে তা'হলে এক একটী জাতিতে (Nation) পরিণত হ'বে। আর সেই

বিভিন্ন জাতিসমষ্টির পারস্পরিক মিলনে গ'ড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Federation of States)। এই পথে চললেই যথাসময়ে সুফল পাওয়া যাবে, অন্য পথে ফল পাওয়া যাবে না। অবশ্য প্রদেশগুলির বর্ত্তমানে যে চৌহুদ্দি আছে, সেই চৌহুদ্দিকেই যে চিরন্তন করতে হ'বে, সে কথা আমি বলছি না। তবে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের ভৌগোলিক সীমার নির্দ্দেশই বাঞ্ছনীয় এবং স্বাভাবিক।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে. সহজেই বুঝতে পারা যায়, আপাততঃ জাতি (Nation) সৃষ্টির উপকরণ এক বঙ্গদেশেই পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। অন্য কোন প্রদেশের বিষয়ে সে কথা বলা চলে না। এই বাংলা দেশেই হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ একটা ভাষা আছে, যার সাহায্যে তাঁরা সাহিত্য চর্চ্চা করেন, আর যাকে তাঁরা বাংলার সাধারণ ভাষা ব'লে স্বীকার করেন। তা'ছাড়া বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আরও অনেক বিষয়ে এমন সব ঐক্যের উপাদান আছে, যার সাহায্যে নেশন বা জাতি-গঠনকার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হ'তে পারে।

অতএব এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বাংলার হিন্দু-মুসলমানের কর্ত্তব্য এবং ভাগ্যের (Destiny) নির্দ্দেশ হ'চ্ছে, এই বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমানকে নিয়ে এবং বাংলা ভাষার সাহায্যে এক অখণ্ড জাতি-গঠন করা। বাংলার দৃষ্টান্ত দেখে অন্যান্য প্রদেশের লোকও ক্রমশঃ এই পথে অগ্রসর হ'তে পারবে।

মুশকিল হ'চ্ছে, আমাদের সামাজিক জীবন মধ্যযুগীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অতীতমুখী; আর আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং শিক্ষাগত আদর্শ হ'চ্ছে আধুনিক যুগের এবং ভবিষ্যন্মুখী। এই অসামঞ্জস্যের দরুণই আমাদের জীবনে নানা রকম বিরোধ এবং ব্যর্থতা এসে দেখা দিয়েছে।

আমাদের সামাজিক জীবনকে আস্তে আস্তে আধুনিক যুগের অবস্থান্তরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তুলতে হ'বে। আধুনিক যুগের জাতীয়তার আদর্শ তখন আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হ'য়ে দাঁড়াবে। বাংলা দেশ দ্রুত এ পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। তবে গতি যাতে আরও দ্রুত হয়, তার জন্য আমাদের সচেষ্ট হ'তে হ'বে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা-সাহিত্য মিলনের পথকে প্রকৃতপক্ষে সহজ ক'রে দেয় নি। তখন টড্, হাণ্টার, ম্যাক্সমুলার (Todd, Hunter, Maxmuller) প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রভাব এদেশে অত্যন্ত প্রবল, আর তাঁদের আওতায় পড়ে বাঙালী অতীতের কাল্পনিক স্বপ্নেই বিভোর হয়েছিল। তখন একজন বাঙালী-হিন্দুর কাছে একজন মারাঠা ছিল একজন বাঙালী-মুসলমানের চেয়েও প্রিয়, আর একজন বাঙালী-মুসলমানের কাছে একজন আফ্রিদী-মুসলমান ছিল একজন বাঙালী-হিন্দুর চেয়েও প্রিয়। এই মানসিকতা ছিল বলেই পরীক্ষার বেলায় জাতীয়তার আদর্শ হার মেনেছে। এখন সাহিত্যিকদের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্য-সাধনা করতে হ'বে, আর অতীতের কলহ-কোন্দল ভুলে ভবিষ্যৎ মিলনের সোনালী স্বপ্ন দেখতে হ'বে।

আসল কথা হ'চ্ছে, এদেশ এখনও শ্মশান-মানসিকতা অতিক্রম করতে পারে নি। শ্মশানঘাটে যেমন মানুষ মরা-মানুষের কথাই বলে, আর মৃত্যুর চিন্তাই করে, মড়া আর মৃত্যু এই দু'টী জিনিষ তাদের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে, আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থাও কতকটা সেই রকম। অতীতের প্রভাব আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। কি ধর্ম্ম, কি রাষ্ট্র, কি সমাজ, কি সাহিত্য সবের উপরই অতীতের এবং অতীতের প্রিয় পরলোকের প্রভাব একান্ত ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, আর আমাদের জীবনকে প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবে প্রভাবান্বিত

করছে। এ হ'ল বাতিকগ্রস্ত (morbid) মনের লক্ষণ। আমরা যদি সত্যই জাতিগঠন করতে চাই, আশার আলোকে উদ্ভাসিত মানুষের মুখ দেখতে চাই, তা'হ'লে জাতিকে শ্মশানঘাট থেকে গৃহাঙ্গনে, সংসারে ফিরিয়ে আনতে হ'বে, আর প্রাণবন্ত বেগবান্ জীবনের জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখের দিকে, মরণ-বাঁচনের নিয়ম-কানুনের দিকে তাদের মনকে আকৃষ্ট করতে হ'বে।

আমার বিশ্বাস, এ কাজ একমাত্র মানবপ্রেমমণ্ডিত (Humanistic literature) সাহিত্যের—যে সাহিত্য বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের মানুষের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই যার আলোচনার প্রধান বিষয়-বস্তুরূপে মেনে নেয়—সাহায্যেই করা যেতে পারে। সেই সাহিত্যই শ্মশানকে ছেড়ে জীবনকেই মানুষের কর্ম্মক্ষেত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট করবে। একবার মানুষের মন যথোচিত ভাবে এদিকে এলে, তারা তখন সহজেই বুঝবে যে, মানুষ হিসাবে হিন্দুও মানুষ আর মুসলমানও মানুষ, সুতরাং উভয়ের দুঃখদূরীকরণ, উভয়ের মঙ্গলসাধন প্রকৃত মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। তখন অতীতকে নিয়ে কলহ-কোন্দল করবার অভ্যাস, ধর্ম্মের পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার আর ধর্ম্মের ঐক্যের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখবার মানসিকতা, মানুষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিভক্ত করবার কদর্য্যতা আস্তে আস্তে চলে যাবে। এসবের জায়গায় আসবে সুমহৎ জাতীয়তার অনুভূতি এবং ঐক্য।

শ্মশান থেকে ফিরে এসেও আমরা পরলোকগত আত্মাদের কথা ভাবি, তাঁদের জন্য বার্ষিকী করি, তাঁদের ছবি টাঙ্গাই, তাঁদের জীবনী লিখি, কিন্তু তখন এসব করি জীবন্ত মানুষ হিসাবে, শ্মশানবৈরাগী হিসাবে নয়। পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিকলাপের, অতীতের গৌরবের সম্মানও আমাদের সেই ভাবেই করতে হ'বে। আর তাতে হিন্দু-

মুসলমান সমান উৎসাহে যোগ দেবে। সে দিন যখন আসবে, তখনই হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন হ'বে।

ইউরোপের কথা একবার ভাবা যাক। অবশ্য বর্ত্তমান যুদ্ধনিরত, উন্মাদগ্রস্ত ইউরোপের কথা বলছি না, ইউরোপীয় সভ্যতার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কথাই বলছি। ইউরোপের লোকেরা সক্রেটিসকেও ভক্তি দেখায় আর যীশুখৃষ্টকেও ভক্তি দেখায়—হোমারের ইলিয়ডও আনন্দের সঙ্গে পড়ে, আর বাইবেলও আনন্দের সঙ্গে পড়ে—রোমের ইতিহাসও আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করে—এপোলো এবং মিনার্ভার ছবিও আঁকে, আর ক্রাইষ্ট এবং ভার্জিন মেরির ছবিও আঁকে—গ্রীক দেবদেবীদের কাহিনীও পড়ে, এহুদিদের পুরাকাহিনীও পড়ে। ইউরোপের লোক শ্মশান-মানসিকতা অতিক্রম করতে পেরেছে বলেই এসব তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে।

বাঙালী তথা ভারতবাসী যখন শ্মশান-মানসিকতা অতিক্রম করবে, তাদের পক্ষেও তখন এসব সম্ভবপর হ'বে। তখন তারা হজরত মোহম্মদকেও ভক্তি দেখাবে আর শ্রীকৃষ্ণকেও ভক্তি দেখাবে; রামায়ণও আনন্দের সঙ্গে পড়বে, মোস্লেম সভ্যতার ইতিহাসও আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করবে—আর ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসও আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করবে—হিন্দুকৃষ্টিমূলক ছবিও আঁকবে, মুস্লিম-কৃষ্টিমূলক ছবিও আঁকবে—হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীও পড়বে আর মুসলমানদের পুরাকাহিনীও পড়বে। তখন বাঙালী সত্যই একতাবদ্ধ এক জাতিতে পরিণত হ'বে। এদেশের হিন্দু-মুসলমান যখন শ্মশান-মানসিকতা অতিক্রম করবে, তখনই এসব সম্ভবপর হ'বে। হিন্দুকে শ্মশান থেকে এবং মুসলমানকে গোরস্থান থেকে বাড়ীতে তুলে আনাই হ'চ্ছে এখন আমাদের প্রধান কাজ।

চীন দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক লিং ইয়েন টাং (Lin Yen Tang) তাঁর 'আমার দেশ, আমার জাতি' (My Country, My People) শীর্ষক মূল্যবান্ গ্রন্থে লিখেছেন :—

"Nothing is more striking than the Chinese humanist devotion to the true end of life as they conceive it, and the complete ignoring of all theological and metaphysical phantasies extraneous to it. When our great humanist Confucius was asked about the important question of death, his famous reply was, "Don't know life—how know death?" An American Presbyterian minister once tried to drive home to me the importance of the question of immortality by referring to the alleged astronomical theory that the sun is gradually losing its energy and that perhaps, after millions of years, life is sure to become extinct on this planet. "Do you realise, therefore," asked the minister "that after all, the question of immortality is important?" I told him frankly "I was unperturbed..................Christianity as a way of life can impress the Chinese, but Christian creeds and dogmas will be crushed, not by superior Confucian logic, but by ordinary Confucian common sense. Buddhism itself, when absorbed by the educated Chinese, became nothing but a system of mental hygiene, which is the essence of Sung philosophy.

"For certain hard-headedness characterises the Chinese ideal of life. There may be imagination in Chinese painting and poetry, but there is no imagination in Chinese ethics. Even in painting and poetry there is sheer, whole-hearted, instinctive delight in common-place life, and imagination is used to throw a veil of charm and beauty over the earthly life, rather than to escape from it. There is no doubt that the Chinese are in love with life, in love with this earth, and will not forsake it for an invisible heaven, They are in love with life, which is so sad and yet so beautiful, and in which moments of happiness are so precious because they are so transient. They are in love with life, with its kings and beggars, robber and monks, funerals and weddings and

child-births and sicknesses and glowing sunshine and rainy nights and festive days and wine-shop-fracas."

চীনেরা পৃথিবীর জীবনকে এতটা গুরুত্ব দেয় বলেই, পারলৌকিক সমস্যা, ধর্ম্মের কূটতর্ক তাদের মনকে একান্তভাবে বিকৃত না করার জন্যই আজ তাদের জীবনে জাতীয়তার আদর্শের এমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছে। রাষ্ট্রনেতা চিয়াং কাই-শেখ ও তাঁর সহধর্ম্মিণী হচ্ছেন মেথডিষ্ট খৃষ্টান। সুঙ্গ-বংশের লোকেরা হচ্ছেন খৃষ্টান। অথচ বর্ত্তমান জাতীয় সংগ্রামে তাঁরাই অখৃষ্টান দেশবাসীদের পরিচালিত করছেন। ধর্ম্ম নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা তুলে না। আজকার ভারতবর্ষে এরূপ কখনও সম্ভবপর হ'ত না। চীনাদের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। পরকে শেখাবার জন্য আমরা একান্ত ব্যগ্র, পরের কাছ থেকে শেখবার ব্যগ্রতাও কি একটু একটু আমাদের অনুভব করা উচিত নয়?

আমি পরলোকের চিন্তা বর্জ্জন করতে বলছি না, ধর্ম্মকেও বর্জ্জন করতে বলছি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি পরলোকে এবং ধর্ম্মে একান্ত-ভাবে বিশ্বাস ক'রে থাকি, তবে পরলোকের নামে এবং ধর্ম্মের নামে যে শ্মশান-মানসিকতা চ'লে আসছে তাকেই আমি বর্জ্জন করতে বলছি। বিকারগ্রস্ত শ্মশান-মানসিকতাকে যদি বর্জ্জন করতে পারি, এই বস্তুতন্ত্র পৃথিবীর ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে যদি সমপ্রজ্ঞান নিয়ে বরণ করতে পারি, আর বাস্তব জীবনকে যে গুরুত্ব দেওয়া উচিত সে গুরুত্ব যদি দিতে পারি, এবং আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীরা, রাষ্ট্র ও সমাজ-নেতারা যদি সেই পরিশুদ্ধ মানসিকতার ভিত্তিতে জীবনসাধনায় অগ্রসর হ'ন, তা'হ'লে জাতীয়তার আদর্শ এদেশে সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত হ'বে এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলন আপনা থেকেই হ'য়ে যাবে। এই মিলনের

বনিয়াদের উপর যে ভবিষ্য বাঙালী জাতির প্রতিষ্ঠা হ'বে, তার গৌরবচ্ছটা বর্ত্তমানের কাল মেঘের অবকাশপথে আমার দৃষ্টিকে যেন উদ্ভাসিত ক'রে তুলছে।

মুক্তির পথ

বিগত সেন্সাস নিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যথেষ্ট মন কষাকষি দেখা দিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানের উপর অন্যায় সংখ্যাবৃদ্ধির অভিযোগ এনেছেন, আর মুসলমান হিন্দুর উপর অন্যায় সংখ্যাবৃদ্ধির অভিযোগ এনেছেন; আর উভয় সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা এমন সব অভিশাপের কথা বলছেন, যা' শুনে প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই মাথা হেঁট হয়। মনে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, আমরা কি সত্যই আত্মনিয়ন্ত্রণশীল হবার যোগ্য?

এ সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদপত্রাদির মন্তব্য পড়ে মনে হয়েছিল, হিন্দু চান মুসলমানের সংখ্যা কমুক, আর মুসলমান চান হিন্দুর সংখ্যা কমুক। এ মনোবৃত্তি জাতীয়তার আদর্শকে নিশ্চয়ই আগিয়ে নিয়ে যাবে না। লজ্জা এবং পরিতাপের বিষয় এই যে, তথাকথিত নেতৃস্থানীয়েরা জনসাধারণকে উচ্চতর আদর্শের সন্ধান দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁরা এমন সব মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, যার ফলে হিন্দু জনসাধারণ মুসলমানদের মরণ কামনা করেছে, আর মুসলমান জনসাধারণ হিন্দুদের মরণ কামনা করেছে। বিষের ধারা তো চারিদিক থেকেই আমাদের জীবনে এসে পড়ছে! এই সেন্সাস-সমস্যা তাতে নূতন এক উৎকট বিষের যোগ করেছে। যাঁরা হিন্দু-মুসলমানের মিলন চান এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান, তাঁদের জন্য এই সেন্সাস-বিভ্রাট নূতন এক সমস্যার আমদানি করেছে। তাঁদের তরফ থেকে কি এই সমস্যার উপর নূতন আলোকপাত করা যায় না?

আমাদের অবিকৃত মন বলে, যে হিন্দু চায় যে মুসলমানের সংখ্যা কমুক, সে হিন্দু কৃপার পাত্র; আর যে মুসলমান চায় যে হিন্দুর সংখ্যা কমুক, সে মুসলমানও কৃপার পাত্র। অথচ এই শ্রেণীর লোকেরই এখন প্রাধান্য।

কোন কারণে যদি হিন্দুর সংখ্যা কমতে থাকে, তা' হ'লে যে মুসলমান প্রকৃতই দেশপ্রেমিক, তার চিন্তান্বিত হওয়া উচিত; পক্ষান্তরে, যদি কোন কারণে মুসলমানের সংখ্যা কমতে থাকে, তা' হ'লে যে হিন্দু প্রকৃতই দেশপ্রেমিক, তারও চিন্তান্বিত হওয়া উচিত। কেন না, যে সত্যকার দেশপ্রেমিক, সে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই মঙ্গল চাইবে, আর যদি এই দুই সমাজের কোনটী ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে থাকে, তা' হ'লে তার প্রতিকারের বিষয়ে সচেষ্ট হ'বে। এ মনোবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন মনোবৃত্তি নিয়ে যিনি দেশের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে চিন্তা করেন, তাঁকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলা যায় না।

পরিতাপের বিষয় এই, যে মনোবৃত্তিকে আমি এখানে কাম্য ব'লে উল্লেখ করলুম, সে মনোবৃত্তি আপাততঃ এ দেশে একান্তই বিরল।

এর কারণ কি? আর প্রতিকারেরই বা উপায় কি?

একটি গল্প মনে পড়ে। বিলাতে একবার আমরা কয়েক জন বন্ধু মিড্‌ল্ টেম্প্‌ল্-এ ডিনার খাচ্ছিলুম। আমাদের দলে একজন দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ ছিলেন—তাঁর নাম রাসেল্। বয়স অনুমান ৩৫ বৎসর। এই পরিণত বয়সেই তিনি আইন শিখতে এসেছিলেন। কল্-নাইট্-এর ডিনার। প্রচুর ভোজ্যদ্রব্যের সদ্ব্যবহার হচ্ছিল। কত রকম গল্প-গুজব চলছিল। ভারতীয় বন্ধুরা সেই চিরন্তন হিন্দু-মুসলিম সমস্যার আলোচনাই করছিলেন। ইংরেজরা আলোচনা করছিলেন জার্মাণীর সামরিক তোড়জোড়ের কথা, ইটালীর অভিপ্রায়ের কথা, আন্তর্জ্জাতিক আরও অনেক কথা।

রাসেল এক চুমুকে এক গ্লাস শ্যাম্পেন শেষ ক'রে বললেন, "শোন, শোন, আফ্রিকার একটা অদ্ভুত গল্প বলি তোমাদের। রাজনীতির আলোচনা তো রোজই কর। আমি যে গল্প বলব, সে রকম গল্প বোধ হয় তোমরা কখনও শোন নি!"

আমি গল্প শুনতে বরাবরই ভালবাসি। আগ্রহের সঙ্গে বললুম "বল, বল, তোমার গল্পটাই তা'হ'লে বল।" রাসেল এক নিঃশ্বাসে আর এক গ্লাস শ্যাম্পেন শেষ ক'রে বললেন, "শোন তবে মনোযোগ দিয়ে:

"আমি জোহান্সবার্গের এক হোটেলে অবস্থান করছিলুম। একদিন ষ্ট্রাইকিং গোছের একটা লোক হোটেলের অতিথি হ'ল। লোকটার চেহারায় যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। মাংসপেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ। অনাবশ্যক মেদ-মাংসের কোন চিহ্ন কোথাও নাই। চোখের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ, সুদূরপ্রসারী—ঠিক ঈগল পাখীর মত। অথচ তাতে একটা করুণার ভাব মাখান ছিল। লোকটিকে একটু অন্যমনস্ক বলে মনে হ'ত, যেন কোন সদ্য-ঘটিত দুর্ঘটনার স্মৃতি তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। লোকটিকে জানবার জন্য আমার মনে কৌতূহল হচ্ছিল।

"একদিন দুপুরে দেখি—লোকটি হোটেলের লাউঞ্জের এক কোণে একা এক সোফায় বসে আছে। সামনে টিপয়ে এক গ্লাস বীয়ার। অন্যমনস্ক ভাবে সে বীয়ার পান করছে, আর কোন্ সুদূরের কথা যেন ভাবছে। আমি ওয়েটারকে এক ডিস খাবার আনতে বলে সোফায় বসে বললুম, 'আপনার আপত্তি নাই তো?' একান্ত সৌজন্যের সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন, 'বসুন, আমি বড় আনন্দিত হলুম।'

"ওয়েটার বীয়ার নিয়ে এল। বন্ধুর নাম জানতে পারলুম হক্। তাঁর বীয়ার প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল। অনুমতি নিয়ে তাঁর জন্য আর এক বোতল বীয়ারের অর্ডার দিয়ে আলাপ আরম্ভ করলুম।

"কত কথা যে হয়েছিল, সে সব এখানে প্রাসঙ্গিক হ'বে না। তার দরকারও নাই। তবে কেন যে তাঁর চোখে মুখে অমন অন্যমনস্কতার ভাব ছিল, তাই নিয়ে তিনি যে গল্প বললেন, তাই এখন শুনাচ্ছি।"

রাসেল বললেন:

কিছুদিন পূর্ব্বে স্মীড (Schmid) নামক এক ডাচ বন্ধুতে আর আমাতে মিলে উগাণ্ডার জঙ্গলে গিয়েছিলুম, কতকটা ভাগ্যপরীক্ষার জন্য। সারা দিন ঘুরে ঘুরে একবার ভয়ানক ক্লান্ত হ'য়ে পড়লুম। গভীর জঙ্গল। জনমানবের চিহ্ন কোথাও নাই। আগুন জ্বালিয়ে একটা গাছের তলায় আমরা আস্তানা বাঁধলুম রাতটি কাটাবার জন্য। রাইফেল দু'টী পাশে রেখে আমরা একটু আরাম নেবার চেষ্টা করলুম। বলা বাহুল্য, অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা গভীর নিদ্রায় অভিভূত হলুম।

আমাদের ঘুম ভাঙ্গল রাত দুপুরে—বর্ব্বর সমর-বাদ্যের কর্ণবিদারক কলরোলে। ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি কাফ্রি নরনারীর দল আমাদের ঘিরে হট্টগোল করছিল। দেখলুম, আমাদের রাইফেল দু'টি এবং আস্‌বাব-পত্র ইতিমধ্যে তারা হস্তগত করেছে। তারা যে আমাদের কি বলছিল, কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমাদের কথাও তারা বুঝলে না। বর্শা উদ্যত ক'রে শেষে আমাদের দিকে তারা অগ্রসর হ'ল। তাদের বাধা দেবার কোন উপায় আমাদের ছিল না। আপাততঃ আত্মসমর্পণই যুক্তিসঙ্গত বলে আমরা স্থির করলুম। যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ আশাও আছে।

কাফ্রিরা আমাদের খোলা মাঠে নিয়ে গেল। মাঠের মাঝখানটা বৃত্তাকারে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। প্রবেশের দ্বারটি অদ্ভুত রকমের একটা তালা দিয়ে তারা বন্ধ ক'রে দিলে আর আমাদের প্রহরী নিযুক্ত করলে এক কাফ্রি তরুণীকে। সে প্রত্যহ দু'বেলা আমাদের আহার দিয়ে যেত—শুটকি মাছের তরকারী আর রুটি, অথবা সিদ্ধ মাংস। আমাদের পানের জন্য সে এক রকম দেশী মদ দিয়ে যেত, তাতে গুড়ের মত এক রকম মিষ্ট জিনিষ মেশান থাকত। খেতে বেশ সুস্বাদ, তবে একটু বেশী খেলেই ভয়ানক ঘুম আসত, আর সমস্ত দেহটা যেন অসাড় হ'য়ে যেত।

বন্ধু স্মীড তৃপ্তির সঙ্গে আকণ্ঠ সেই দেশী মদ পান করতেন, আর সারা দিন তন্দ্রামগ্ন থাকতেন। তাঁর ব্যবহার মোটেই আমার ভাল লাগত না। আমরা কাফ্রিদের হাতে

বন্দী। কি ক'রে মুক্তি পেতে পারি, দিনরাত তাই নিয়ে চিন্তা করা দরকার; এ কি মদ খেয়ে ঘুমোবার সময়? তা' ছাড়া এই নেশার প্রভাবে ঘুমিয়ে যাওয়া কখনও আমি পছন্দ করিনি। ঘুম আসবে, তেমন ভাবে নেশা করব কেন? জেগে থাকাই তো জীবন! আমি পান করতাম চেতনাকে বেশী ক'রে পাবার জন্য, চেতনাকে বিলুপ্ত করবার জন্য নয়। তারপর অসভ্যদের মধ্যে আত্মসম্মান হারিয়ে মদ খেয়ে বেসামাল হওয়া, সেটাও আমার কাছে নিতান্ত হেয় কাজ বলেই মনে হ'ত। স্মীডকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কোন ফল হয় নি। তাঁর মুখে সেই একই বুলি—'ঈট্, ড্রিঙ্ক, এণ্ড বি মেরি, ফর্ টুমরো উই ডাই।' আমি এক চুমুকের বেশী মদ কখনও খেতুম না, আর সেটুকুও বাধ্য হয়েই খেতুম। কেন না, ও দেশের আন্‌ফিল্টার্ড জলের উপর আমার বিশ্বাস ছিল না। স্মীডের শরীর দেখে অবাক্ হয়ে যেতুম। তিনি অসম্ভব রকম মোটা হ'য়ে যাচ্ছিলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁর এই ফ্যাটী ডিজেনারেসি দেখে সত্যই আমি দুঃখিত হতুম।

কাফ্রিরা রোজ এসে আমাদের দেখে যেত। গায়ে পিঠে হাত দিয়ে আমরা আশানুরূপ মোটা হয়েছি কি না, তারা তা' পরীক্ষা করত। স্মীডকে পরীক্ষা ক'রে যে তারা অনাবিল আনন্দ পেত, সে তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যেত। তাদের রসনা থেকে সত্যই জল পড়ত। আমার দেহ পরীক্ষা ক'রে কিন্তু তাদের ভ্রূকুঞ্চিত হ'ত। আমি ক্রমেই রোগা হ'য়ে যাচ্ছিলুম। সেটা তাদের মোটেই ভাল লাগত না।

ইঙ্গিতে ইসারায় আমাদের রক্ষিণীকে প্রশ্ন ক'রে বুঝলুম, তারা আমাদের বড় এক জাতীয় পর্ব্বের জন্য দেবতার বলিরূপে প্রস্তুত করছে। আমরা যথাসম্ভব মোটা হই, এই তাদের ইচ্ছা। হৃষ্টপুষ্ট বলির সামগ্রীই দেবতার বেশী প্রিয়। আমাদের মদের সঙ্গে এমন এক জিনিষ মিশিয়ে দেওয়া হ'ত, যাতে ক'রে দেহ অসম্ভব রকম পুষ্টি লাভ করে। আমরা যাতে মোটা হই, সেই জন্য এই মদ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের দেওয়া হ'চ্ছে। স্মীডের দেহ যে ভাবে ভরে উঠেছে, তা দেখে তারা সত্যই সন্তুষ্ট। তবে আমি যে শুকিয়ে যাচ্ছি, এতে তারা সত্যই দুঃখিত। আমি যাতে যথেষ্ট পরিমাণে পানাহার করি, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে রক্ষিণীকে তারা নির্দ্দেশ দিয়েছে। রক্ষিণী বললে, 'এতে বিচিত্র কিছুই নাই। রোগা জন্তুর মাংস কে খেতে চায় বল?'

আমি স্মীডকে আমাদের অবস্থার কথা বললুম, আর পানাহারের বিষয়ে সংযম অবলম্বন করতে উপদেশ দিলুম। অপরিমিত মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে তাঁর মস্তিষ্কের বিকৃতি

ঘটেছিল। তিনি আমার কথার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন না। হাসতে হাসতে তাঁর সেই পুরান গৎ আওড়াতে লাগলেন—'ঈট্, ড্রিঙ্ক, এণ্ড বি মেরি, ফর্ টুমরো উই ডাই !'

দেখলুম, স্মীডকে উপদেশ দিয়ে লাভ নাই। নিজের বিষয় ভাবা দরকার। পানাহার তো আমি কম করতুমই, এখন আরও কমিয়ে দিলুম। আর দিনরাত কেবল মুক্তির কথাই চিন্তা করতে লাগলুম, মুক্ত জীবনের স্বপ্ন দেখতে লাগলুম, আর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে লাগলুম।

আমাদের তরুণ রক্ষিণী আমার ব্যবহার দেখে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। মধ্যে মধ্যে সে আমার সঙ্গে কথা এবং ইঙ্গিতের সাহায্যে আলাপ করত, আর আমার বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করত।

একদিন সে বললে, 'তোমার উপর আমার দরদ জন্মেছে, তোমাকে এই বিপদ্ থেকে মুক্তি না দিলে আমি শান্তি পাব না।'

আমি মুক্তিই খুঁজছিলুম, মুক্তির চিন্তাতেই মশগুল ছিলুম। মুক্তির একটা উপায় হয়েছে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলুম। স্মীডকে জাগিয়ে বললুম 'রক্ষিণী আমাদের সাহায্য করবে, চল এখান থেকে পালান যাক।'

স্মীড তখন অসম্ভব রকম মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। সর্ব্বক্ষণ তিনি তন্দ্রার আবেশে মগ্ন থাকতেন। দুর্গম বন-জঙ্গল অতিক্রম ক'রে পালাবার শক্তি তাঁর ছিল না। আমার প্রস্তাব শুনে জড়িতকণ্ঠে বললে 'দরকার নেই বাবা! বনে জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুকের খোরাক হওয়ার চেয়ে এখানে মানুষের খোরাক হওয়াই ভাল।' দেখলুম স্মীডের মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

সুযোগ বুঝে রক্ষিণীর সাহায্যে একাই রাত্রিযোগে বেরিয়ে পড়লুম। আসবার সময়ে সেই করুণহৃদয় রক্ষিণীকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিয়ে এলুম, তার জন্য এর বেশী কিছু করবার ক্ষমতা আমার ছিল না। স্মীডকে ভাল ক'রে বিদায় অভিবাদন করতেও পারলুম না। তিনি তখন মদের নেশায় বিভোর!

দশ দিন, দশ রাত ক্রমাগত বন-জঙ্গল পার হ'য়ে, কপালের জোরে অসংখ্য বিপদ্ অতিক্রম ক'রে আমি শেষে বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকার এলাকায় এসে পৌছুলুম। বড় একটা দোকানে গিয়ে ম্যানেজারকে আমার এই অপূর্ব্ব এড্ভেঞ্চারের কথা বললুম। তিনি ছিলেন হৃদয়বান্ লোক। আমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করলেন, আর প্রয়োজনীয়

কিছু নগদ টাকা আমায় তিনি দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি এই জোহান্সবার্গে এসেছি. এখান থেকে আমার ফার্ম ছুদিনের পথ !"

রাসেল গল্প শেষ ক'রে বললে, 'কেমন গল্প ?' আমরা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বল্লুম, 'এমন গল্প আমরা কখনও শুনিনি।'

সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু রাসেলের গল্প এখনও ভুলতে পারি নি। বাংলার সেন্সাস-বিভ্রাটের কথা ভাবতে ভাবতে গল্পটি হঠাৎ আমার মনে এল। আমার মনে হ'ল, এই গল্পের মধ্যেই যেন আমাদের মুক্তির ইঙ্গিত আছে।

অনেকে ভাববেন, গল্প তো হ'ল ; কিন্তু এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সমস্যার সম্পর্ক কি ?

আমাদের দেশের এই বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষটাকে যদি গল্পের কাফ্রি উপজাতি রূপে ধরে নেওয়া হয়, আর কাফ্রিদের দেওয়া মদকে যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের লভ্যাংশ রূপে ধ'রে নেওয়া যায়, তা'হ'লে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নামক রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচবার একটা উপায় এই গল্প থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

হক এবং স্মীড উভয়কেই কাফ্রিরা তাদের মদ খেতে দিয়েছিল। হক ছিল বুদ্ধিমান্, সংযমী লোক। সে সেই মদ যথাসম্ভব বর্জ্জন করেছিল। পক্ষান্তরে, স্মীডের বুদ্ধি ছিল মোটা, আর লোভ ছিল বেশী। কাফ্রিদের দেওয়া মদ সে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণেই সেবন করেছিল। হক এবং স্মীড উভয়েই ছিল বন্দী। হক কিন্তু দিনরাত মুক্তির চিন্তায় মগ্ন থাকত, মুক্তির স্বপ্ন দেখত, আর মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করত, তাই শেষে সে তার বাঞ্ছিত মুক্তি লাভ ক'রে ধন্য হ'ল।

স্মীড মুক্তির কথা ভাববার অবসর পেত না। দিনরাত সে কাফ্রিদের দেওয়া মদের নেশায় বিভোর থাকত। মুক্তির উপায় যখন

উপস্থিত হ'ল. তখন সে মুক্তির স্পৃহাই হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং মুক্তিলাভ তাহার ভাগ্যে আর ঘটল না।

কাফ্রি রক্ষিণীকে আমাদের কৌশলী বুদ্ধি ধরে নিন। যে সজাগ থাকে, যার কোন একটা উদ্দেশ্য কিম্বা কাম্য আছে, কৌশলী বুদ্ধি তাকেই পথ দেখায়; আর সে-ই বুদ্ধির নির্দ্দেশের সদ্ব্যবহার করতে পারে। হককে বুদ্ধি পথ দেখিয়েছিল. আর সেও বুদ্ধির প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করতে পেরেছিল। স্মীডকে বুদ্ধি পথ দেখায় নি। বন্ধু হিসাবে হক যদিও তাকে মুক্তির পথে নিতে চেয়েছিল, আলস্য এবং নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ স্মীড কিন্তু বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করতেই পারলে না।

আমাদের মধ্যে যে হকের মত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নামক রাক্ষসের দেওয়া লোভের মোহ যথাসম্ভব বর্জ্জন করবে আর এই রাক্ষসের হাত থেকে মুক্তি পাবার চিন্তায় সদা বিভোর থাকবে, তাকে কাফ্রি রক্ষিণী-রূপী সুবুদ্ধি এসে মুক্তির পথ শেষে বাংলে দেবে, আর মুক্তির অদম্য স্পৃহা সে পথ অবলম্বন করতে তাকে বাধ্য করবে। পক্ষান্তরে, যে স্মীডের মত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-রূপ রাক্ষসের প্রদত্ত লোভের মদ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেবন করবে, তার মন থেকে মুক্তির স্পৃহা চ'লে যাবে, মুক্তিলাভের জন্য যে সাধনার দরকার, সে সাধনার ক্ষমতাই তার লোপ পাবে, আর বন্ধুরা মুক্তির উপায় বলে দিলেও, সে উপায় সে অবলম্বন করতে পারবে না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-রূপ রাক্ষসই শেষে তাকে ভক্ষণ করবে।

বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ হ'চ্ছে তরুণেরা, কবি এবং সাহিত্যিকরা; তাঁরা এদিকে সচেতন হ'লে ভাবী কালে জাতীয়তার রাজপথে সম ব্যথা-বেদনায় হাত ধরাধরি ক'রে চলবার পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের কোন বাধা বা সমস্যাই রইবে না।

ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য

সাহিত্য আকাশ থেকে পড়ে না, মাটিতেই জন্মায়। যে মাটিতে সাহিত্য জন্মায়, সেই মাটির বৈশিষ্ট্য সেই সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে সাহিত্য হ'চ্ছে একটা জাতির জীবনের, তার জীবনাদর্শের, তার সুখ-দুঃখের, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

ইংরাজি সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। প্রাথমিক যুগের ইংরাজি সাহিত্যে গৌরবের বস্তু হ'চ্ছে ইংরাজি বাইবেল (Old & New Testaments), স্পেন্সারের Faery Queen আর চসারের Canterbury Tales. এই সব গ্রন্থ জাতির সেই সময়ের জীবনের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে। তখন মানুষের ধর্ম্ম নিয়ে কারবার। রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ, রাণী, রাজকুমারী, সামন্ততন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ—এই সব নিয়েই কারবার। সুতরাং এই সবের প্রতিচ্ছবিই সে যুগের সাহিত্যে দেখতে পাই।

তারপর এল রাণী এলিজাবেথের আর কবি সেক্সপীয়ারের যুগ; ড্রেক, ওয়ালটার র‍্যালে, বেকনের যুগ। ইংলণ্ডে তখন নূতন জীবন

নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। পুরাতন বিশ্বাস নিস্তেজ হয়েছে, নূতন বিশ্বাস এসে দেখা দিয়েছে। পুরাতন আদর্শ স্তিমিত প্রদীপের মত প্রাণহীন হ'য়ে পড়েছে, নূতন আদর্শ নূতন আগুনের মত চারিদিকে তার শিখা বিস্তার করেছে। চারিদিকে নূতনের আগমনী-গীত আর পুরাতনের মরণোন্মুখ প্রাণহীনতা। এলিজাবেথ-যুগের সাহিত্য এই সমাজ ও জীবনেরই বিকাশ এবং প্রকাশ। এরই প্রতিচ্ছবি আমরা সে-যুগের ইংরেজি সাহিত্যে দেখতে পাই।

সেক্সপীয়ারে ধর্ম্মের কথা আছে বটে; কিন্তু দাঁতের (Dante) লেখায় যেমন ধর্ম্মজীবনই মধ্যমণি, সেক্সপীয়ারের লেখায় ঠিক তেমনটি মিলে না। সেখানে ধর্ম্ম হ'চ্ছে জীবনের অন্যতম কাম্য, একমাত্র কামনা নয়। প্রেমের চেয়ে কম তার উন্মাদনা, রাজনীতির চেয়ে কম তার গুরুত্ব, দর্শনের চেয়ে কম তার মনের উপর দাবী আর অধিকার। ইংরাজ খৃষ্টান ধর্ম্ম নিয়ে গর্ব্ব করে না। তা'রা গর্ব্ব করে মাতৃভূমি ইংলণ্ড নিয়ে। ইংরাজ মনীষী পরলোকের চিন্তায় বিভোর হ'ন না, বিভোর হ'ন প্রকৃতির রহস্য নিয়ে, ইংরাজ যোদ্ধা দূর প্যালেষ্টাইনে মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য অন্তরের প্রেরণা অনুভব করে না; সে অন্তরের প্রেরণা অনুভব করে প্রতিবেশী ফরাসী খৃষ্টানদের সঙ্গে, রাজ-আত্মীয় স্পেনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য। ইংরাজ যুবকের মনে স্বর্গের স্বপ্নের চেয়ে তার প্রেমিকার স্বপ্নই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে বেশী। এই যে নূতন সমাজ, তার ছবিই সে-যুগের ইংরেজী সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই। সে-যুগের সাহিত্য হ'চ্ছে সমসাময়িক জীবন এবং মননেরই প্রতীক।

তারপর এল বিলাস-বিরোধী, আনন্দ-বিরোধী পিউরিট্যানিজম্ (Puritanism)-এর যুগ। ক্রমওয়েল হ'ল রাজা, প্রেসবিট্যারিয়ানিজম্ (Presbyterianism), মেথডিজম্ (Methodism) প্রভৃতি হ'ল ধর্ম্ম।

পাপ কি আর পুণ্য কি (অবশ্য ধর্ম্মগ্রন্থের দিক্ থেকে), সেই হ'ল আলোচনার প্রধান বিষয়-বস্তু। সেই যুগের সাহিত্যিক মিল্টন, বানিয়ান প্রভৃতির গ্রন্থাবলী হ'ল এই মানসিকতারই প্রতিচ্ছবি।

তারপর এল পুনঃপ্রতিষ্ঠার (Restoration) যুগ। আবার ইংলণ্ডে রাজা ফিরে এল, আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম ফিরে এল; বিলাসিতা ফিরে এল, আভিজাত্য ফিরে এল। মানুষের মন গেল বিলাসের দিকে, আমোদ-প্রমোদের দিকে, আড়ম্বরের দিকে, আভিজাত্যের দিকে। সে যুগের সাহিত্যেও তাই সেই মানসিকতাই প্রকাশ পেল।

তারপর রাণী এনের (Queen Anne) ক্লাসিসিজম্ (Classicism) এল, তারপর প্রথম হ্যানোভারিয়ান (Hanovarian) যুগের রোমান্টিসিজমের (Romanticism) আবির্ভাব হ'ল। উভয় শ্রেণীর সাহিত্যই তার নিজস্ব যুগের মননশীলতাকে প্রকাশ করে গেল। তারপর এল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের ভিক্টোরিয়া (Victoria) যুগ, যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে (১) রাষ্ট্রনীতিতে উদার মতবাদ (২) অর্থনীতিতে অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) (৩) ধর্ম্মের বিষয়ে সন্দেহবাদ (Scepticism) (৪) বৈজ্ঞানিক ক্রম-বিকাশবাদে একান্ত বিশ্বাস (৫) দর্শনে নাস্তিকতামূলক আদর্শের প্রাধান্য (৬) ইংরাজ জাতির নিজের ভবিষ্যৎ গৌরবের বিষয়ে ঐকান্তিক বিশ্বাস (৭) ব্যষ্টি ও সমাজজীবনে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রাধান্য।

সে যুগের সাহিত্য হয় এসব মতবাদকে সমর্থন ক'রে, না-হয় এসবের প্রতিবাদ ক'রেই গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রনীতিতে জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill), ব্যাগট (Baghot), সিলি (Seely) প্রভৃতির প্রাধান্য দেখতে পাই। ধর্ম্মে হাক্সলে, ইনগ্রাম প্রভৃতির

প্রাধান্য দেখতে পাই। বিজ্ঞানে ডারউইন, স্পেন্সার প্রভৃতির প্রাধান্য দেখতে পাই। দর্শনে গ্রীণ, ব্রাডলে প্রভৃতির এক দিকে প্রাধান্য দেখতে পাই, অন্য দিকে প্রাধান্য দেখতে পাই যুক্তিবাদের (Rationalism)—যার প্রধান প্রতিনিধি হচ্ছেন জেম্‌স মিল এবং তাঁর প্রতিভাবান পুত্র জন ষ্টুয়ার্ট মিল। সাহিত্যে বিদ্রোহমূলক রাস্‌কিন, কার্লাইল প্রভৃতির, রক্ষণশীল আর্ণল্ড, টেনিসন, থ্যাকারে প্রভৃতির আর আদর্শমূলক সাহিত্যিক মরিস, রোজেটি (Morris, Rossette) প্রভৃতির প্রাধান্য দেখতে পাই।

এ যুগ ইংলণ্ডের সত্যই স্বর্ণযুগ। এ যুগের চিন্তাধারায় যুগের ছাপ সুস্পষ্ট।

তারপর এল এই বর্ত্তমান জর্জিয়ান (Georgian) যুগ—মহাযুদ্ধোত্তর যুগ। এ যুগের সাহিত্যেও যুগের ছাপই পড়েছে। সাহিত্যিক এবং কবিদের বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে জিজ্ঞাসু মন, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি অবিশ্বাসের ভাব, নূতন কিছুর জন্য আগ্রহপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, গতানুগতিকতার প্রতি অবিশ্বাস, ভবিষ্যতের বিষয়ে কল্পনা-জল্পনা।

প্রকৃত পক্ষে, একটা জীবন্ত জাতির জীবন যেমন গতিশীল, তার সভ্যতা যেমন গতিশীল, তার সাহিত্যও তেমনি গতিশীল।

বাংলাদেশের দিকে একবার লক্ষ্য করলে সঠিক বুঝতে পারা যায় যে, বাঙালীর জীবন সত্যই গতিশীল, বাঙালীর সভ্যতা সত্যই গতিশীল, আর বাঙালীর সাহিত্যও সত্যই গতিশীল। এ কথা বিশেষভাবে বাঙালী-হিন্দুর সম্বন্ধে খাটে, বাঙালী-মুসলমানের জীবনের বিষয়ে অবশ্য এখনও খাটে না। কেন না, বাঙালী-মুসলমান এখনও স্থবিরতার স্তর অতিক্রম করতে পারেনি। বাংলা দেশের সভ্যতা-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব এখনও হিন্দুর হাতে। মুসলমান সে দায়িত্ব গ্রহণ করেনি,

আর তাদের এখন সে ক্ষমতাও নাই। তবে প্রগতিপন্থী মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক ব্যাপকতর সভ্যতার, জীবনাদর্শের এবং সাহিত্যের সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের সে প্রচেষ্টা বাংলার জীবনে যথেষ্ট প্রভাবও বিস্তার করছে। এ যে আশার কথা, সন্দেহ নেই।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির যুগের কথা এখানে বলব না। ভারতচন্দ্র, আলাওয়াল প্রভৃতির যুগের আলোচনাও করব না। বিদ্যাসাগরের যুগ থেকেই আরম্ভ করা যাক। বিদ্যাসাগরী সাহিত্যে সে-যুগের পণ্ডিতী মনোভাব বিদ্যমান। ভাষা টোলের পণ্ডিতের মত, আর ভাবও টোলের পণ্ডিতেরই মত। তারপর এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি পণ্ডিতী ভাব এবং ভাষা ছেড়ে আধুনিক ভাব এবং ভাষার সৃষ্টি করলেন। বাংলা ও বাঙালীর সভ্যতা বিশ্বসভ্যতার আওতায় এসে দাঁড়াল, বিশ্বসভ্যতার সঙ্গে নেওয়া-দেওয়া হ'ল তার সুরু। বাঙালীর চিন্তা-জগতে এক বিপ্লব এসে দেখা দিল। এত বড় বিপ্লব বাংলা দেশে পূর্ব্বে বোধ হয় কখনও আসেনি। সে যুগের বাংলা সাহিত্যে সেই মানসিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে।

তারপর এল রবীন্দ্র-যুগ। সে যুগের পরিসমাপ্তি ঘটল মহাকবির মহাপ্রয়াণে। কিন্তু নূতন যুগের আগমনী-গান স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়—যদিও উভয় মনীষীই রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেই পরলোকে চ'লে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের যুগ এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে এবং বঙ্কিমযুগের সাহিত্য থেকে ক্রমবিকাশের পথে স্বতঃই স্ফূর্ত্তিলাভ করেছে। উভয় সাহিত্যেই দেখতে পাই আভিজাত্যের মহিমা-কীর্ত্তন; উভয় সাহিত্যেই দেখতে পাই সামন্তবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের ভূমিকা; উভয় সাহিত্যই ভারত অর্থে হিন্দু-ভারতের কথাই বলেছে এবং বুঝেছে; উভয় সাহিত্যেই দেখতে পাই ভিক্টোরিয়ান স্বাধীন চিন্তাকে

(Victorian liberalism) হিন্দু-দর্শনের সাহায্যে চালাবার প্রচেষ্টা; উভয় সাহিত্যেই বাংলার হিন্দু ভদ্রশ্রেণীর জীবনকেই বাংলার সাধারণ জীবনরূপে চালাবার চেষ্টা হয়েছে; উভয় সাহিত্যই শ্রমিক শ্রেণীর জীবনকে সমানভাবে পাশ কাটিয়ে গেছে; আর উভয় সাহিত্যই নারীকে পুরুষের জীবনবিকাশের একটা উপলক্ষ্যরূপেই দেখেছে।

তবে সূক্ষ্মভাবে দেখলে এই দুই সাহিত্যধারার মধ্যে যে প্রভেদ এসে দেখা দিয়েছে, তা'ও আমাদের চোখে পড়ে। বঙ্কিম-যুগের শ্রমিক হ'চ্ছে ছোটলোক! রবীন্দ্র-যুগের শ্রমিক কিন্তু ছোটলোক নয়, সেও মানুষ। অভিজাত ভিত্তির উপর উভয় সাহিত্যই প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাধারণ মানুষেরও স্থান আছে, যদিও সে স্থান অত্যন্ত অপরিসর। বঙ্কিম-সাহিত্যের ভারতবর্ষ সরাসর হিন্দু ভারতবর্ষ—অহিন্দুর স্থান তাতে নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অহিন্দুর স্থান যা' আছে তা' অকিঞ্চিৎকর। তবে একথাও সত্য যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে মানবপ্রীতির উল্লেখ খুব বেশী স্থান পেয়েছে। বঙ্কিম-সাহিত্যে নির্জ্জলা ভিক্টোরিয়ানিজমই (Victorianism) দেখতে পাই, অবশ্য সে আদর্শের ভারতীয় সংস্করণ। রবীন্দ্র-সাহিত্যে সে আদর্শ নিয়ে বিভিন্ন দিক্ থেকে প্রশ্ন জেগেছে, যদিও প্রশ্নের ভঙ্গী যথেষ্ট মৃদু এবং নিরীহ। মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীই উভয় সাহিত্যের বনীয়াদ (normal society), তবে নিম্নতর শ্রেণীর মানুষও রবীন্দ্র-সাহিত্যে একেবারে বাদ পড়েনি। শ্রমিক জীবনের সমস্যা রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে নগণ্য স্থান পেয়েছে বঙ্কিম-সাহিত্যে তা'ও পায়নি, আর নারীর প্রকৃত দাবীর, প্রকৃত অধিকারের আর সমাজে তার প্রকৃত স্থানের আলোচনা বঙ্কিম-সাহিত্যে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করা হয়েছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে সে দৃষ্টিভঙ্গী আরও একটু ব্যাপক ও উদারতাপূর্ণ। যুগের পারিপার্শ্বিকতার মাঝে ইহাই হয়তো সম্ভব ছিল।

তাই বলছিলুম শরৎচন্দ্র এবং সত্যেন্দ্রনাথ যদিও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেই পরলোকে চলে গিয়েছেন; তবু কিন্তু সাহিত্যের ক্রমবিকাশের দিক্ থেকে দেখতে গেলে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী যুগের লোক। কেন না, বঙ্কিম যে-সমস্যার কথা ভাবেননি, রবীন্দ্রনাথ যে-সব সমস্যাকে একান্ত অস্পষ্টভাবেই দেখেছেন, সে-সব সমস্যা পূর্ণাঙ্গ ভাবমূর্ত্তি ধরেছে এই দুই লেখকের রচনাবলীতে। শ্রমিক-সমস্যা, নারীর প্রকৃত দাবী এবং অধিকারের সমস্যা, পতিতের এবং পতিতার সমস্যা, পুঁজিহীন মানুষের সমস্যা—এ সব এই দুই লেখকের লেখায় দেখা দিয়েছে। অবশ্য বর্ত্তমানে কারও কারও লেখায় এই সব সমস্যা এবং আধুনিক অন্যান্য সমস্যা স্পষ্টভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে সুরু করেছে মাত্র। সমাজ-দেহের ক্ষতকে নির্ভীকচিত্তে দেখিয়ে দিলে, প্রতিকারের উপায় এসে যাবে। রোগ-নির্ণয়ের (Diagnosis) বিষয়ে আমাদের যত্নবান্ হ'তে হ'বে। এ কাজ ব্যাপকভাবে হওয়া দরকার। আশা করি, প্রতিভাশালী সাহিত্যিকরা অতীতের মোহ কাটিয়ে এ পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করবেন। অবশ্য এখনও অনেকে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত বাঁধাধরা পথেই চলেছেন। তাঁদের প্রতি কোন অভিযোগ না এনেও, ইহা বলা অসঙ্গত নয় যে, যুগের তাগিদ-মত দৃষ্টিভঙ্গী না বদ্‌লালে সাহিত্যিকের যুগ-সাধনা সার্থক হ'বে না। তবে এও স্বীকার করতে হ'বে যে, সব সাহিত্যই রাষ্ট্র এবং অর্থনীতিক সমস্যাসূচক নয়—যদিও এই দুই সমস্যা উৎকট মূর্ত্তি ধরে বর্ত্তমানে আমাদের জীবনে দেখা দিয়েছে। এখানে আমি যুগধর্ম্মের তাগিদে সৃষ্ট সাহিত্যেরই আলোচনা করছি।

এখনও অতীতের আলোচনা প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত স্থান সাহিত্য-ক্ষেত্র জুড়ে বসেছে। বর্ত্তমানের আলোচনা কিছু কিছু চললেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা' ভাবমূলক, যুক্তিমূলক নয়। ভবিষ্যতের আলোচনা

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাই না বললেও অত্যুক্তি হ'বে না। এ বড় গৌরবের বিষয় নয়। কেন না, জীবন্ত জাতির লক্ষ্য সাধারণতঃ এবং মুখ্যতঃ ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যন্মুখী জাতিই বড় হয়। অতীত-মুখী জাতি পতনের দিকেই যায়। যারা বর্ত্তমান নিয়েই সন্তুষ্ট, তাদের ভবিষ্যৎ নেই বললেও অত্যুক্তি হ'বে না। একমাত্র ভবিষ্যন্মুখী জাতিই প্রাণচঞ্চল হয়। ইউরোপের ভাবুকদের মন সর্ব্বদা ভবিষ্যতের দিকে। ওয়েলস্ (H. G. Wells) ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন, শ' (Bernard Shaw) ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন, হাক্সলে (Aldous Huxley) ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন। একদিক্ থেকে না একদিক্ থেকে ইউরোপের প্রত্যেক মহামনস্বীই ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছেন। নীট্‌সে (Nietzsche) অতিমানবের স্বপ্ন দেখেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের ইউরোপীয় সাহিত্য তাঁর প্রভাবেই গড়ে উঠেছে। ইব্‌সন, ষ্ট্রীনড্‌বার্গ, শ' প্রভৃতি যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যেও নীট্‌সের বিশেষ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপের রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁর প্রভাবের কথা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় জীবন এবং রাষ্ট্রীয় সাধনা মুখ্যতঃ নীট্‌সের চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। ইটালীর রাষ্ট্রগুরু মুসোলিনি তাঁকে নিজের গুরুরূপে স্বীকার করেছেন।

কার্ল মার্ক্সের চিন্তার কথা ভাবলেও দেখা যায়, তাঁর চিন্তা, কল্পনা এবং গবেষণাকে অবলম্বন ক'রে রুষরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সাম্যবাদ (Communism) গড়ে উঠেছে, সমাজতন্ত্রবাদ গড়ে উঠেছে।

মোদ্দা কথা, ইউরোপের মন স্বভাবতঃ ভবিষ্যন্মুখী, আর আমাদের মন স্বভাবতঃ অতীতমুখী। এখন আমাদের মনকেও ভবিষ্যন্মুখী করতে হ'বে। যে জাতির ভবিষ্যৎ নাই, তার অতীতের মূল্য কি আর বর্ত্তমানেরই বা মূল্য কি?

বাঙালী সাহিত্যিকদের কর্ত্তব্য তাঁদের মনকে, তাঁদের চিন্তাকে, তাঁদের কল্পনাকে ভবিষ্যন্মুখী করা। একশত বৎসর পরে বাংলাদেশ কেমন হ'বে, ভারতবর্ষ কেমন হ'বে, এশিয়া কেমন হ'বে, পৃথিবী কেমন হ'বে তা' নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে শেখার দরকার। শতাব্দী পরে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ কিরূপ হ'বে, শতাব্দী পরে পারিবারিক জীবন কিরূপ হ'য়ে দাঁড়াবে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পিতামাতার কিরূপ সম্বন্ধ হ'বে বা কিরূপ হওয়া উচিত, তা' নিয়ে কবি, সাহিত্যিক, ভাবুকেরা ভাবুন। শতাব্দী পরে হিন্দু-মুসলমান থাকবে কি না; যদি থাকে, তা'হ'লে তাদের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ হ'বে, তা'ও ভাবতে শিখুন। শতাব্দী পরে জীবনযাত্রা-প্রণালী কিরূপ হ'বে, তা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি দিয়ে স্থির করা দৃষ্টিশীল সাহিত্যের ধর্ম্ম।

এসব নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করলে সত্যিকার দর্শনের দিকে, চিরন্তন সত্যের দিকে, মানুষের বিধিদত্ত স্বভাবের দিকে, মানুষের জন্মগত অধিকারের দিকে, মানুষের প্রতি সমাজের দায়িত্বের দিকে, সমাজের প্রতি মানুষের দায়িত্বের দিকে, নরনারীর সম্বন্ধের প্রাকৃতিক ভিত্তির দিকে, এক কথায় জীবনের মূলগত সত্যের দিকে ভাবুকের দৃষ্টি স্বভাবতঃই যাবে। আর তার ফলে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হ'বে, সে সাহিত্য সত্যই আমাদের আদরের, আমাদের গৌরবের, আর আমাদের আশার জিনিষ হ'বে। ভবিষ্যতের বাংলা-সাহিত্য যেন ভবিষ্যন্মুখী হয়, বর্ত্তমানের পটভূমির উপর তা' যেন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বাংলা ভাষাভাষীকে আলিঙ্গন ক'রে আপন ক্রোড়ে টেনে আনতে পারে, সুজলা সুফলা বাংলার মাটি-জল-আকাশের মহিমা-কীর্ত্তনে তা যেন মুখর হ'য়ে উঠে, এই হ'ল আমার অন্তরের কামনা।

প্রেমের ধর্ম্ম

"আমি প্রেমাস্পদের প্রেমই বুঝি।

"সে প্রেম মসজিদেই পাওয়া যাক, আর মন্দিরেই পাওয়া যাক, কিছু তাতে আসে যায় না! সেই প্রেমাস্পদের প্রেমিক যারা, তাদের কাছে মোস্‌লেম কে, আর অমোস্‌লেম কে, এ সবের আলোচনার কোন অর্থই নাই! একবার যাবে নিজের অন্তরের দিকে, একবার যাবে বন্ধুর গলির দিকে! প্রেমিকের জন্য এর চেয়ে ভাল পথ আর নাই! হে ব্রাহ্মণ, ইসলাম তো আমায় ছেড়েছে, তুমি কিন্তু এ পথভ্রষ্টকে ছেড় না! প্রতিমার মন্দিরে যেতেও তার যে কোন সঙ্কোচ নাই!

"কত বার লোকে আমায় বলেছে, উপবীত পর, ঘোর পৌত্তলিক তুমি! আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, আমার দেহে কোন রগটি আছে, যা' উপবীতে পরিণত হয়নি!"

—আমীর খসরু

হজরত মোহাম্মদ এসেছিলেন মানব-চরিত্রের উৎকর্ষসাধনের জন্য, সমাজ-জীবনের উন্নয়নের জন্য, ন্যায় এবং সুবিচারের প্রতিষ্ঠার জন্য। ধর্ম্মমূলক অনুশাসনের সাহায্যে, বিধি-নিষেধের দৃঢ় রজ্জুর সাহায্যে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির জীবনকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর সাধনার প্রধান লক্ষ্য বস্তু। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে আরব জাতির প্রাধান্য ও তাঁদের সাম্রাজ্য বিশ্বময় বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছিল। অভাবিত সৌভাগ্য এবং সমৃদ্ধির

ফলে কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মে ও সমাজজীবনে গ্লানি এসে উপস্থিত হ'ল। ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা ভুলে, মহাপুরুষের আদর্শের কথা ভুলে সাধারণ ধর্ম্মযাজকেরা এবং ধর্ম্মগ্রন্থের ব্যাখ্যাকারেরা আঁকড়ে ধরলেন আক্ষরিক অনুশাসনকে, বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলকে আর আচারের প্রাণহীন কাঠামোকে। ফলে, সমাজে এসে দেখা দিল অন্তঃসারহীন টীকার যুগ, প্রেরণাহীন ব্যাখ্যার যুগ। ধীরে ধীরে শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা লোকে ভুলে গেল; শব্দ আর তার আভিধানিক এবং বৈয়াকরণিক অর্থ নিয়েই সাধারণ পণ্ডিতদের মধ্যে মাতামাতি চলতে লাগল।

সাম্রাজ্যবিস্তারের ফলে আরবেরা বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল। গ্রীক সভ্যতা তখনও মরেনি। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিষ্টটল, ইউক্লিড, গ্যালিয়েন প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারা তখনও পূর্ব্ব-রোমাণ সাম্রাজ্যে ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল; আরবেরা এই চিন্তাধারার সংস্পর্শে এল। জীবনের ধারা তাদের মধ্যে তখন উদ্দামবেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। মহাপুরুষ মোহাম্মদ স্বয়ং জ্ঞানের সাধক ছিলেন এবং জ্ঞান-সাধনার জন্য শিষ্যদের সবিশেষ উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রীক জ্ঞানের সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান পেয়ে আকণ্ঠ সে অমৃত তাঁরা পান করলেন; ফলে, চিন্তাশীল সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিনব এক ভাবধারা এসে দেখা দিল—যাকে যুক্তিবাদ (Rationalism) নামে অভিহিত করা যেতে পারে। "সব তত্ত্বের বিচার যুক্তির সাহায্যে করতে হ'বে, এমন কি ধর্ম্মেরও"—এই হ'ল এই দলের আদর্শ। যাঁরা এই আদর্শের অনুসরণ করতেন, তাঁরা "মোতাজেলা" নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছেন। "মোতাজেলা"বাদ একদিন মোস্‌লেম জগতে সবিশেষ বিস্তার এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বাগদাদের বিখ্যাত

খলিফা আল্ মামুন স্বয়ং মোতাজেলা-মত অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর যুগে মোতাজেলাবাদ রাজকীয় ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয়।

তবে জনসাধারণ ছিল আচারপন্থী, গতানুগতিক, আর তাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন সাধারণ মোল্লা মৌলুভির দল। তাঁদের মধ্যে এবং মোতাজেলাবাদীদের মধ্যে বাদানুবাদ এবং পরে সংঘর্ষ চলতে লাগল। রাজশক্তিও শেষে আচারপন্থী শক্তিশালী মোল্লা মৌলুভিদের হস্তগত হ'ল। মোতাজেলাবাদীদের উপর তখন ভীষণ উৎপীড়ন চলতে লাগল। ফলে, মোতাজেলাবাদ শেষে মুসলিম-জগৎ থেকে বিতাড়িত হ'ল। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে গতানুগতিক আচার-ধর্ম্ম একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করল। সংস্কারের কাল মেঘে মোস্‌লেম-জগৎ আচ্ছন্ন হ'ল।

এই সময়েই কিন্তু নূতন এক ভাবধারা এসে আবার মুসলিম জগৎকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলল। এই ভাবধারাকে সুফিবাদ বলা হ'য়ে থাকে। মোতাজেলাবাদীরা তাঁদের সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন চিন্তা এবং যুক্তির উপর। সুফিরা তাঁদের সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন প্রেম এবং প্রেরণার উপর। মোতাজেলাবাদীরা বিজ্ঞান এবং দর্শনের সাহায্যে সত্যের পথে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করেছিলেন আর সুফিরা প্রেম এবং আবিলতামুক্ত অন্তরে প্রাপ্ত ঐশ্বরিক প্রেরণার সত্যস্বরূপ এবং সৌন্দর্য্যস্বরূপ খোদার মিলনের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার ফলে মোসলেম জগতে এক অভিনব ভাবধারা, অভিনব এক সাধন-ধারা এসে দেখা দিয়েছিল। ফলে মরণোন্মুখ মুসলিম সভ্যতা আবার নূতন জীবন লাভ করেছিল। সুফিদের সাধন-ধারা মহাপুরুষদের প্রবর্ত্তিত বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সাধন-পদ্ধতিগুলিকে এক একটী তরিকা বা পন্থা বলা হ'য়ে থাকে।

কোন তরিকার গুপ্ত রহস্য জানতে হ'লে, সে তরিকার পীরের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়। আমি কখনও কোন পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিনি, সুতরাং সে রহস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের দাবী আমি করতে পারি না। তবে ভাবসম্পদের দিক্ থেকে সুফিরা যে দান বিশ্ববাসীকে, বিশেষতঃ মুসলিম জাতিকে দিয়ে গেছেন, সেটা সত্যই জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধার বস্তু।

সুফি-ভাবধারা ইরাণে সবিশেষ বিস্তার লাভ করেছিল; যে ফার্সি কাব্য-সাহিত্য বিশ্বসভ্যতার অন্যতম গৌরবের বস্তু, তার জীবনধারা এই সুফি আদর্শ থেকেই প্রবাহিত হয়েছিল। শামস তবরেজ, রুমী, সাদী, হাফেজ, জামী প্রভৃতি মহাকবিরা সকলেই সুফিপন্থী ছিলেন। ওমার খৈয়ামের কবিতাও সুফিভাবমূলক, তবে তিনি সুফি ছিলেন বলে মনে হয় না। মধ্যযুগের দরবেশ, আওলিয়া প্রভৃতি সকলেই সুফি-মতবাদী ছিলেন।

মুসলিম সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সুফিবাদ ভারতবর্ষে এসে দেখা দেয়, এবং ভারতীয়, বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলিম জীবনকে বিশেষ-ভাবে প্রভাবান্বিত করে। খাজা মইনুদ্দিন চিশতী, নিজাম উদ্দীন আউলিয়া, শাহ সুফি-সুলতান, শাহ জালাল প্রভৃতি বিখ্যাত তাপসেরা সকলেই সুফিমতাবলম্বী ছিলেন। আমীর খসরু, উরফী, ফায়জী, আবুল ফজল, কবীর, সারমুদ প্রভৃতি কবিরা সুফি-আদর্শই প্রচার ক'রে গিয়েছেন। সম্রাট্ অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন রাষ্ট্রীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, খলিফা আল্‌মামুনের সময়ে মোতাজেলবাদ যেমন রাজকীয় সম্মান লাভ করে, মহামতি সম্রাট্ আকবরের সময়ে সুফিবাদ তেমনি সাম্রাজ্যের স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবর আজীবন সুফিমতবাদী ছিলেন এবং পরিণত বয়সে পীর বা ধর্ম্মগুরুরূপে নিজেকে প্রচার করেন।

মধ্যাহ্ন আকাশে পৌছাবার পরই সূর্য্য অস্তাচলগামী হয়, পাকার পরই ফল পচতে আরম্ভ করে, পূর্ণ বিকাশের পরই ফুল ঝরতে থাকে। কি সভ্যতা, কি মানবজীবন, এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত নয়। পরিণতির পর তারাও পতনের পথে অগ্রসর হয়। অশোকের পর বৌদ্ধধর্ম্ম পতনের পথে গিয়েছিল, আল্ মামুনের পর মোতাজেলাবাদ পতনের পথে গিয়েছিল, আকবরের পর সুফিবাদও পতনের পথেই গিয়েছে। মৃত্যুর জীবাণু প্রত্যেক আদর্শবাদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে। আদর্শ পূর্ণ-পরিণতি লাভ করলে জীবাণুগুলি পুষ্ট হয়, আর তার পর সেই আদর্শকে বিনষ্ট ক'রে তবে ছাড়ে। যে সুফিবাদ একদিন এই বিশ্বে সগৌরবে বিরাজ করত, এখন সে আদর্শ পীর-পূজা, কবর-পূজা প্রভৃতি অর্থহীন, অনেক ক্ষেত্রে অনিষ্টকর আচারেই পর্য্যবসিত হয়েছে।

সুফি-আদর্শের বাইবেল হ'চ্ছে জালালুদ্দীন রুমীর 'মাসনাভী' নামক বিরাট্ কাব্যগ্রন্থ। প্রত্যেক দুই লাইনের মধ্যে মিল রেখে যে কবিতা লেখা হয়, ফার্সিতে তাকেই মাসনাভী ছন্দ বলে। রুমীর সমগ্র গ্রন্থটী এই ছন্দে লেখা হয়েছে বলেই এ-কে মাসনাভী নামে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান, চিন্তা এবং ভাবের ঐশ্বর্য্যে এ গ্রন্থ সত্যই অতুলনীয়। মানুষ কিসের সন্ধানে ফেরে, কিসের জন্য তার অন্তরের ব্যাকুলতা, কার বিরহে সে কেঁদে বেড়ায়, এই চিরন্তন সমস্যার আলোচনা নিয়েই রুমী তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধ করেছেন। এ সব প্রশ্নের তিনি যে উত্তর দিয়েছেন, তাই হ'ল সুফিবাদের মূল কথা। মহাকবি বলেছেন ঃ

"বাঁশীর সুর শোন!
কেন সে নিজের কথা বলে চলেছে ?
কিসের বিরহে সে কাঁদছে ?

সে বলে, যে দিন হ'তে ঝাড় থেকে তারা আমায় বিচ্ছিন্ন করেছে, সেই দিন থেকেই আমার এই ক্রন্দন!

আমার বিলাপ শুনে নরনারী সকলেই চোখের জল ফেলতে থাকে! মনের সব কথা কিন্তু আমি খুলে বলতে পারি না!

আমি চাই বুক আমার শতধা বিদীর্ণ হোক, তবে তো আমার বলার সাধ মেটে!

জন্মভূমি থেকে যে দূরে পড়ে আছে, তার একমাত্র সাধনা হ'ল জন্মভূমিতে ফিরে যাবার সাধনা! আমার অবস্থাও ঠিক তাই!

যেখানে যাই সেইখানেই কাঁদি! বড়দের সভায় গিয়েছি, সেখানে কেঁদেছি! ছোটদের সভায় গিয়েছি সেখানেও কেবল কেঁদেছি!

কেন আমি কাঁদি?

আমার কাঁদার মধ্যেই তার সন্ধান তুমি পাবে!

তবে সাধারণ মানুষ অন্ধ, বধির!

চোখ তাদের আছে বটে, কিন্তু তারা দেখতে পায় না!

কাণ তাদের আছে বটে, কিন্তু শুনতে পায় না!

এই আমাদের দেহ থেকে প্রাণ তো দূরে থাকে না; আর প্রাণও দেহ থেকে দূরে থাকে না; অথচ প্রাণ বস্তুটাকে কেউ দেখতে পায় না!

বাঁশীর এই ক্রন্দন, সে কিছু বাতাসের ফুৎকার নয়। লেলিহান জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! এ শিখা যার প্রাণে নাই তার মরাই ভাল!

বাঁশীর মত বিষ কে কবে দেখেছে? আর বাঁশীর মত বিষপাথরই কে কবে দেখেছে?

বাঁশীর মত সঙ্গী কে কবে দেখেছে? বাঁশীর মত দরদী বন্ধু কে কবে দেখেছে?

বাঁশী সেই পথের সংবাদ আমাদের শুনায় যে পথে আছে বিপদ, যে পথে আছে মৃত্যু!

মজনুর প্রেম-কাহিনী সে আমাদের বলে!

বাঁশীর মুখে দুইটী ঠোঁট!

আমারও বন্ধু দুইটী ঠোঁট আছে। আমার এক ঠোঁট প্রেমাস্পদের অধরোষ্ঠের সঙ্গে মিলিত, আর এক ঠোঁট তোমাদের উদ্দেশ্যে কাঁদছে, বিলাপ করছে, সঙ্গীতের মধ্যে বিষাদের করুণ সুর তুলছে!

দেখবার চোখ যার আছে, সে বুঝতে পারে। তোমাদের কাছে আমার যে এই ক্রন্দন, তার উৎস হ'চ্ছে অপর প্রান্তে!

আমার বাঁশীর সুর—তাঁর সুরেরই প্রতিধ্বনি!

আমার আত্মার ক্রন্দন—তার ক্রন্দনেরই প্রতিধ্বনি!

যে তথ্য আমি প্রচার করি, তাঁর অর্থ সেই বোঝে যে আপনভোলা মানুষে পরিণত হয়। গানের সমঝদার সেই শ্রোতা, শোনবার কাণ যার আছে!

বিরহের ক্রন্দনে দিনের পর দিন আমার কেটে যাচ্ছে; ক্রন্দন আর বিলাপ এই হ'ল আমার জীবন!

কেঁদেই আমি জীবন কাটাচ্ছি! তাতে কিন্তু আমার দুঃখ নাই। হে আবিলতামুক্ত পবিত্রতার স্বরূপ, তুমি সগৌরবে এই বিশ্বে বিরাজ কর (তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট)!

যে মৎস্য নয়, সেই অল্প জলে সন্তুষ্ট হয় (মৎস্যের জন্য সমুদ্রের অনন্ত সলিলরাশির দরকার)!

যার কপালে এ ভোগ নাই, বৃথাই তার জীবন!

চিরসুন্দর, চিরসত্যের সঙ্গে মিলন ছাড়া মানুষের জীবন সার্থক হয় না। সুফি কিন্তু বলেন, সে মহামিলনের রত্নমণ্ডিত সৌধে উঠতে হ'বে নশ্বরের প্রেমের সোপানাবলী অতিক্রম ক'রে। নশ্বর প্রেমাস্পদকে ভালবাসতে হ'বে। সেই ভালবাসাই অবিনশ্বর প্রেমের সন্ধান দেবে। নশ্বর জীবনকে তাচ্ছিল্য করলে, অবিনশ্বর জীবন আমাদের করায়ত্ত হ'বে না। নশ্বর প্রেমাস্পদকে তাচ্ছিল্য করলে অবিনশ্বর প্রেমাস্পদ আমাদের ধরা দেবে না। সোপান অতিক্রম না ক'রে যেমন হর্ম্ম্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় না, নশ্বরের প্রেম অতিক্রম না ক'রে তেমনি অবিনশ্বরের প্রেমে পৌছান যায় না।

সুফিবাদের এই মূল তত্ত্বটী মহাকবি জামী সুন্দর এক উপাখ্যানের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন:

এক শিষ্য তার পীরের কাছে গিয়ে বললে, আমায় সাধনার পথ দেখান!

পীর বললেন, তুমি কি কারও প্রেমে পড়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছ? তা' যদি না হ'য়ে থাক, তাহলে এক্ষুনি গিয়ে কাউকে ভালবাসতে আরম্ভ কর। তার পর, যথাসময়ে আমার কাছে এস!

নিশ্চয় জেন, রূপের শরাব পান না ক'রে কেউ অরূপের অমৃত উপভোগ করতে পারবে না!

তবে অবশ্য রূপের জগৎকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না; রূপের জগৎ হ'ল অপরিহার্য্য এক সেতু! যত শীঘ্র পার এ সেতু অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হও!

গন্তব্য স্থানে যদি পৌঁছুতে চাও, সেতুর উপর তা'হ'লে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না! যত শীঘ্র পার সেতু অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হও!

খোদাকে ধন্যবাদ, যতদিন এই নশ্বর রূপের জগতে আমি ছিলাম, ততদিন প্রেমের খেলা খুব খেলিয়েছি!

ধাত্রী আমার নাড়ীকে মায়ের নাড়ী থেকে বিযুক্ত করেছিল প্রেমের ছুরিকা দিয়ে!

মা প্রেমের তাড়নাতেই আমার মুখে স্তন রেখে তাঁর দুগ্ধ দিয়েছিলেন!

মস্তকের কেশ আমার এখন দুগ্ধের মতই শুভ্র। মাতৃদুগ্ধের মধুর স্বাদ এখনও কিন্তু আমি ভুলতে পারি নি!

কি বার্দ্ধক্যে, কি যৌবনে, প্রেমের মত বস্তু নাই!

প্রেমের যাদুই অনবরত আমার মনকে চালিয়ে যাচ্ছে!

হে জামী, প্রেমের পথেই তুমি বৃদ্ধ হ'য়েছ! সব ছেড়ে এখন এই প্রেমের পথেই মর!

প্রেমিক সুফি মানবপ্রেমের মধ্যেই ভগবৎপ্রেমের সন্ধান পেয়েছিলেন, ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, জীবনের গুপ্ত রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। সুফির আদর্শ মহাকবি সাদী অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

বিশ্ববাসীর সেবা ছাড়া ধর্ম্ম আর কিছু নয়!

তসবিহ্‌-গণনা (মালা জপ করা), জানামাজে বসে প্রার্থনা, আর সুফির মোটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে বেড়ান, এ সবকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলে গণ্য করা যায় না!

প্রেমিক সুফি পৌত্তলিককে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন না। চিরসুন্দরের

অপরূপ সৌন্দর্য্যের একটুখানি আভা প্রতিমার দেহে পড়েছে বলেই তো পৌত্তলিক তার সামনে প্রণত হয়। এই সত্যটীকে মহাকবি ওমার খৈয়াম অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন :

প্রতিমা-পূজককে সম্বোধন ক'রে প্রতিমা বললে, হে ভক্ত! কেন তুমি আমার সামনে প্রণত হ'চ্ছ তাকি তোমার জানা আছে?

তাঁর সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব আমার উপর এসে পড়েছে!

তাইতো তুমি আমার প্রেমিক! তাইতো তুমি আমার ভক্ত!

অক্ষরবাদী আচারপন্থীদের মধ্যে শাস্ত্রের প্রত্যেক বিধানের, শাস্ত্রের প্রত্যেকটী উক্তির চুলচেরা ব্যাখ্যা নিয়ে অনবরত কলহ-কোন্দল চলেছে। সে কলহের শেষ নাই, সে কোন্দলের মীমাংসা নাই। ফলে, জীবনে এসে দেখা দেয় মারামারি, কাটাকাটি আর খুনোখুনি। প্রেমের নামে হিংসার তাণ্ডবলীলা, প্রেমস্বরূপের জন্য ষোড়শোপচারে বিদ্বেষের পূজা; জ্ঞানী সুফির কাছে এ কলহের কোন সার্থকতা নাই। মহাকবি হাফেজ সুফির আদর্শ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন :

বাহাত্তরটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এই যে কলহ—তার জন্য তাদের ক্ষমা কর! সত্য দেখতে পায়নি বলেই অলীকের পেছনে তারা গিয়েছে।

প্রকৃত সুফির কাছে হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খৃষ্টান সবই সমান। সকলকে ভালবাসতে হ'বে, সবের দুঃখ দূর করতে হ'বে, সবের ধর্ম্মের সম্মান করতে হ'বে, এই হ'ল সুফির মহান্ আদর্শ। হাফেজের কথায় :

হে হাফেজ! তুমি যদি সত্য-স্বরূপের সঙ্গে মিলন কামনা কর, সকলের সঙ্গে তা'হ'লে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন কর! মুসলমানের সঙ্গে আল্লা-আল্লা বল, আর ব্রাহ্মণের সঙ্গে বল রাম রাম!

এই উদার মনোভাবের বহু নিদর্শন আমাদের এই বাংলা দেশেই বর্ত্তমান আছে। এখানে আমার প্রত্যক্ষ এক অভিজ্ঞতার কথা বলছি। হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া নামক এক গ্রাম আছে। একদা বাদশাহী

আমলে এ স্থান সমৃদ্ধ এক জনপদ ছিল। এখনও সেখানে বিরাট্ এক মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ এবং অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান প্রকাণ্ড এক মিনার দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই পাণ্ডুয়ায় সাহ স্ফি স্থলতান নামক বিখ্যাত এক দরবেশের মজার বা সমাধি-সৌধ বর্ত্তমান আছে। স্থলতান জালালুদ্দীন খিলজীর সময়ে শাহ সাহেব বাংলা দেশে এসেছিলেন। মজারের নিকটে ক্ষুদ্র একটা মসজিদ আছে। সেই যুগের তৈয়েরী সেই মসজিদে এখনও নামাজ হ'য়ে থাকে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশেই শাহ্ সাহেবের মজার।

আমি একবার মোটরযোগে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। মজার দর্শনের উদ্দেশ্যে মোটর থেকে নামলুম। তখন সন্ধ্যা সমাগত। মসজিদ থেকে আজানের আহ্বান শুনতে পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে আরতির শঙ্খ এবং কাঁসর-ঘণ্টাও বেজে উঠল। এমন অপূর্ব্ব ঘটনা ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখিনি। আমাদের সঙ্গে এক বৃদ্ধ খাদেম বা সেবাইত ছিলেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলুম। তিনি যা' বললেন তা' শুনে বিস্ময়ে সত্যই অভিভূত হলুম। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম্ম এই যে, মুসলমানের যিনি খোদা তিনিই হিন্দুর ভগবান। তাঁরই উদ্দেশ্যে আজানের ডাক আর শঙ্খের হাঁক। ভাষা, আচার, রীতি এ সবই তো বাইরের। অন্তর্য্যামী মানুষমাত্রেরই অন্তর দেখে বিচার করেন এবং প্রেম ও ভক্তির বন্ধনে বাঁধা পড়েন। সর্ব্বশাস্ত্র তাঁরই মহিমা-কীর্ত্তন করে; সেই প্রেমের ঠাকুরকে যিনি জেনেছেন বা চিনেছেন তাঁর ভেদবুদ্ধি থাকতে পারে না।

বৃদ্ধ সেবাইতের সহজ সরল বিশ্বাস আমার অন্তর অভিভূত করল। আমি সসম্ভ্রমে আনত হ'য়ে কবর চুম্বন করলাম। ফিরবার পথে বার বার মনে হ'তে লাগল, হায়, আমরা বাঙালী যদি আজ এই প্রেমের ধর্ম্মে অভিষিক্ত হ'তে পারতাম তা'হ'লে সৌহার্দ্দ্যে, প্রেমে, আত্মার

আত্মীয়তায় এ দেশে কি শ্রেয়ঃ, শান্তি ও কল্যাণই না বিরাজ করত! বাংলার সরস চিত্তক্ষেত্রে স্থফি ও বৈষ্ণবের পারস্পরিক প্রভাব, সংমিশ্রণ ও রসায়ন এক-অপূর্ব্ব সহজ প্রেমধর্ম্মের আবির্ভাব সম্ভব ক'রে তুলেছে। ইহা যেমনি মানবধর্ম্মী, তেমনি সার্ব্বজনীন। স্বার্থান্ধ লোকের প্ররোচনা না থাকলে, বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলন খুবই সহজ ছিল এবং এখনও আছে আর ভাবীকালেও থাকবে।

জাতীয় জাগরণ

ভারতবর্ষের ধনবল আছে, জনবল আছে, গৌরবময় ইতিহাস আছে, মহামূল্য আর্থিক সম্পদ্ আছে, সবই আছে, অথচ এদেশ যেন প্রাণহীন! কোন বিরাট্ জাতীয় স্পন্দন এখানে অনুভূত হয় না। সভ্য, শক্তিশালী জাতিদের পঙক্তিতে এর স্থান নাই। বিশ্বসমস্যার আলোচনা কিম্বা সমাধানে ভারতবর্ষের মতামত কেউ জিজ্ঞাসা করে না।

ছেলেবেলায় পড়া ঘুমন্তপুরীর ঘুমন্ত রাজকুমারীর কথা আমার মনে পড়েঃ রাজকুমারীর জন্মোপলক্ষে দ্বাদশটী পরী নিমন্ত্রিত হলেন। কেবল একটী পরীকে নিমন্ত্রণ করতে সকলে ভুলে গেল। দশটী নিমন্ত্রিত পরী রাজকুমারীকে বর দিলেন। কেউ বিদ্যার বর দিলেন, কেউ সৌন্দর্য্যের বর দিলেন, কেউ লাবণ্যের বর দিলেন, কেউ বর দিলেন রাজকুমারীর অন্তর করুণায় ভরা থাকবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। রাজপুরী যখন উৎসবের আনন্দে মুখর, ঠিক সেই সময়ে যে পরীটীকে লোকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গিয়েছিল, তিনি সহসা এসে উপস্থিত হলেন। পরণে কাল কাপড়, মাথায় কাল টুপী, হাতে কাল ছড়ি। ক্রোধে মুখমণ্ডল তাঁর বিকৃত। রোষকম্পিত কণ্ঠে তিনি বললেন

"বটে! এত উৎসব, এত আনন্দ অথচ আমার কথা কেউ মনে করলে না! আমার নিমন্ত্রণ হ'ল না! বেশ! ভাল ক'রে আজ তোমাদের আমি শিক্ষা দিচ্ছি; আর সব পরীরা দিচ্ছেন বর, আমি দেব অভিশাপ। রূপে, গুণে রাজকুমারী অতুলনীয়া হবেন, একথা সত্য; কিন্তু আমি অভিশাপ দিচ্ছি, যেদিন রাজকুমারী যৌবনে পদার্পণ করবেন, সেই দিনই তাঁর মৃত্যু হ'বে।" অভিশাপ দিয়ে ক্রুদ্ধ কাল পরী অদৃশ্য হলেন।

রাজপুরীতে ক্রন্দনের রোল উঠল। সব উৎসব, সব আনন্দ মুহূর্ত্তের মধ্যে থেমে গেল, একটী নিমন্ত্রিত পরী কিন্তু তখনও বর দেওয়া শেষ করেন নি। তিনি সকলকে সম্বোধন ক'রে সান্ত্বনার কণ্ঠে বললেন, "ক্রুদ্ধ কাল পরীর অভিশাপ ব্যর্থ করবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে তা' সত্ত্বেও রাজকুমারীকে জিইয়ে রাখতে আমি পারব। আমার বরে রাজকুমারী একেবারে মরবেন না, তবে একশত বৎসর জীবন্মৃতা হ'য়ে থাকবেন, অঘোরে ঘুমিয়ে থাকবেন। একশত বৎসর অতিবাহিত হ'লে পর, কোন ভাগ্যবান্ এক রাজকুমারের সোনার কাঠির স্পর্শে তিনি জেগে উঠবেন। আর তারপর পরম সুখে তাঁর জীবন কাটবে।"

পরীর কথামত যৌবনে পদার্পণ করেই রাজকুমারী ঘুমিয়ে পড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজা-রাণী, দাস-দাসী, নফর-চাকর, হাতী-ঘোড়া, কুকুর-বিড়াল, এক কথায় রাজপুরীর যে যেখানে ছিল সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। দাসী বাসন মাজতে মাজতে ঘুমিয়ে পড়ল, ছোকরা চাকরটা কুকুর তাড়াতে তাড়াতে ঘুমিয়ে পড়ল, বিড়াল ইঁদুরের পেছনে দৌড়তে দৌড়তে ঘুমিয়ে পড়ল, ইঁদুর পালাতে পালাতে ঘুমিয়ে পড়ল। বিশাল রাজপুরী মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাণহীন জড়ের মতই নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল।

বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ কেটে যেতে লাগল। রাজপুরী জঙ্গলে ঢাকা পড়ল। তার স্মৃতি পর্য্যন্ত মানুষের মন থেকে বিলুপ্ত হ'ল।

তারপর, ঠিক একশত বৎসর শেষ হবার সময়ে দিব্যকান্তি এক রাজকুমার শিকারের উদ্দেশ্যে সেই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি সেই ভুলে-যাওয়া জীর্ণ প্রাসাদ দেখতে পেলেন। কৌতূহলপরবশ হ'য়ে তিনি প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করলেন। তিনি যা' দেখলেন, তাতে বিস্ময়ের তাঁর অবধি রইল না। মানুষ, জীব, জন্তু সকলেই নিজ নিজ কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রাণের স্পন্দন নাই, অথচ কেউ তারা মরেনি। বিস্ময়বিমুগ্ধ রাজকুমার কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যেতে যেতে শেষে রাজকুমারীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন।

এ কি? এমন রূপ তো কোন রক্ত-মাংসবিশিষ্ট জীবের কখনও হয় না! এ কি কোন মায়ার খেলা, না কোন পরী ছলনা ক'রে শুয়ে আছেন? রাজকুমারের মনে প্রেমের জোয়ার নামল। আত্মহারা হ'য়ে তিনি রাজকুমারীকে সোণার কাঠির দ্বারা স্পর্শ করলেন। নিমেষের মধ্যে রাজকুমারীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজপুরী জেগে উঠল। রাজা চাকর-বাকরদের ডাক দিলেন। রাণী রাজকুমারীর সন্ধানে বের হলেন। দাসী বাসন মাজা সুরু ক'রে দিল। বাবুর্চ্চি খানা প্রস্তুত করবার কাজে মেতে গেল। ছোকরা চাকরটা কুকুরকে তাড়া করতে লাগল। বিড়াল ইঁদুরের পেছনে দৌড়তে লাগল। ইঁদুর পালাতে লাগল। জীবনের কোলাহলে রাজপুরী আবার মুখর হ'য়ে উঠল।

ভারতবর্ষের অবস্থাও সেই ঘুমন্ত রাজকুমারীরই মত। দুষ্ট কূটচক্রী কাল পরীর মোহরূপ অভিশাপে ভারত-রাজকুমারী আজ গভীর নিদ্রায় মগ্না। তবে দিব্য প্রেমময়ী পরী বর দিয়েছেন, রাজকুমারী মরবেন না, ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট রাজকুমারের সচেতন সোণার কাঠির ছোঁয়ায় আবার জেগে উঠবেন। সেদিন সঙ্গে সঙ্গে এই বিশাল পুরীর সকলেই জেগে উঠবে। জীবনের কোলাহলে ভারতের আকাশবাতাস পুনরায় মুখরিত হ'বে।

তবে প্রশ্ন এই, কবে সেই ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট রাজকুমার আসবেন? তাঁর আবির্ভাবের লক্ষণ কি দেখে বোঝা যাবে?

বিখ্যাত আরব নৃ-তাত্ত্বিক ইবনে খালদুন বলেছেন, আরব জাতির মধ্যে তখনই ব্যাপক প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছে, যখন কোন মহাপুরুষ তাদের মধ্যে অভিনব কোন ধর্ম্ম-মতবাদের প্রবর্ত্তন করেছেন। ধর্ম্মকে যদি ব্যাপক অর্থে নেওয়া যায়, অর্থাৎ ধর্ম্ম বলতে যদি আমরা বুঝি সেই আদর্শ, যার অনুসরণ এবং প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ তার সব কিছু এমন কি তার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়াকে পরম কল্যাণের নির্দ্দেশ বলে মনে করে, তা'হ'লে ইবনে খালদুনের উক্তি কেবল আরব জাতির সম্বন্ধে কেন, বিশ্বের সব জাতির সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। জাতি তখনই সত্যকার জেগে উঠে, যখন তার মধ্যে উন্মাদনাময় একটা প্রেরণা, জীবন্ত-জ্বলন্ত একটা আদর্শ এসে দেখা দেয়। মানুষ তখন সেই সুমহান আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্র প্রেমোন্মাদ হ'য়ে উঠে; আত্ম-নিবেদন এবং বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠা জাগে না। অনন্তকাল সাধনায়ও সে বিমুখ হয় না। এ অনেকটা সাগর-সঙ্গম-পিয়াসী স্বতোৎসারিত গিরি-নির্ঝরিণীর বহু বিচিত্র বন্ধুর পথে আনন্দাভিসারের মত।

সে আদর্শের স্বরূপ কি? মানুষের মনকে এমন গভীর ভাবে আলোড়িত করতে হ'লে তার মধ্যে কি কি বিশেষত্ব থাকা চাই?

ইতিহাসের আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক অন্তরস্পর্শী আদর্শের পেছনেই একটা ক্রন্দন, একটা হাহাকার আছে। সেই ক্রন্দন, সেই হাহাকারই হ'ল সেই আদর্শের দ্যোতক। আদর্শের কাজ হ'ল সেই ক্রন্দনকে থামান, সেই হাহাকারকে বিদূরিত করা। কেবল তাই নয়, সে আদর্শ আসে ব্যথার ক্রন্দনের স্থানে আনন্দের হাসি ফুটাতে, দুঃখের হাহাকারের স্থানে সুখের তরঙ্গায়িত কাকলীর

সৃষ্টি করতে। প্রথম দেখা দেয় বঞ্চিতের ক্রন্দন, তারপর দেখা দেয় স্বার্থকতার আনন্দ-কলরব। শিশু ক্ষুধার তাড়নায় মায়ের দুগ্ধের জন্য কাঁদে, চিৎকার করে। মা তাকে দুধ দেন। মাতৃস্তন্যপানে আনন্দে আবার সে উৎফুল্ল হ'য়ে হাসে। এও অনেকটা সেই রকম।

তবে একথা মনে রাখা দরকার, শিশু যখন দুধের জন্য কাঁদে তখন জল দিলে চলবে না, দুধই তাকে দিতে হ'বে। যে জিনিষের অভাবে একটা দেশে কিম্বা সমাজে হাহাকার উঠেছে, সেই জিনিষ দয়েই তার অভাব পূরণ করতে হ'বে, অন্য কিছু দিলে চলবে না। সুতরাং কিসের অভাব এদেশে অনুভূত হ'চ্ছে, সেইটেই প্রথম দেখা দরকার। তারপর দেখা দরকার, কি দিয়ে সেই অভাব পরণ করা যেতে পারে।

বর্ত্তমান ভারতের তথা বাংলার প্রধান অভাব হ'চ্ছে (১) ব্যাপকতর জীবনের, (২) অর্থ-নৈতিক স্বচ্ছলতার, আর (৩) রাষ্ট্রীয় জীবনের গভীর গূঢ় আন্তরিক ভিত্তির।

এমন এক যুগ ছিল, যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাজা-বাদশাদের মধ্যে, আমীর-ওমরাহদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জনসাধারণ রাষ্ট্রের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হ'ত না, হ'তে চাইত না। এখন সে যুগ আর নাই। এখন সব শ্রেণীর লোকই রাষ্ট্রের ব্যাপারে সচেতন, সকলেই রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানে অংশ নিতে চায়। বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানে একথা আমাদের ভুললে চলবে না।

অতীত যুগে অর্থনৈতিক জীবন একটা সংকীর্ণ অথচ সুনির্দ্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হ'ত। কামারের ছেলে কামার হ'ত, কুমোরের ছেলে কুমোর হ'ত, দর্জ্জির ছেলে দর্জ্জি হ'ত, চাষার ছেলে চাষা হ'ত, পণ্ডিতের ছেলে পণ্ডিত হ'ত, যোদ্ধার ছেলে যোদ্ধা হ'ত, আমীরের ছেলে আমীর

হ'ত, রাজার ছেলে রাজা হ'ত। এখনকার জীবন কিন্তু সে রকম সুনির্দ্দিষ্ট-ভাবে চলে না। সব এখন ওলট-পালট হ'য়ে গেছে। চাষার ছেলে এখন পণ্ডিত হয়, পণ্ডিতের ছেলে এখন সৈনিক হয়, কামারের ছেলে এখন যোদ্ধা হয়, এই রকম কত কিছু হয়। পুত্র এখন পিতার ব্যবসা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। যার যে ব্যবসা ভাল লাগে, সে সেই ব্যবসাই অবলম্বন করে।

তা'ছাড়া অর্থনৈতিক জীবনের চাহিদাও এখন অনেক বেড়ে গেছে। তখনকার যুগে লোকের অভাব ছিল অল্প, আর সহজেই সে অভাব মিটত। এখনকার অভাব বিবিধ আকারের আর বিবিধ প্রকারের। সে অভাবপূরণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, প্রচুর সরঞ্জামের প্রয়োজন। তারপর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে; আর সেই বৈশিষ্ট্যের খোরাক যোগাবার জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক উপকরণের প্রয়োজনও বেড়ে চলেছে। ব্যষ্টির দাবী সমাজের অর্থনৈতিক সম্পদের উপর ক্রমেই উৎকট হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে, সমাজে দেখা দিচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism), সাম্যবাদ (Communism), বলশেভিজম্ (Bolshevism) প্রভৃতি কত কি অর্থ-নৈতিক আদর্শ এবং পরিকল্পনা!

তুমুল এই প্রতিযোগিতার যুগে রাষ্ট্রীয় বন্ধনের গভীর আন্তরিক ভিত্তির প্রয়োজন অতি স্পষ্টভাবে এ যুগে অনুভূত হ'চ্ছে বলেই পৃথিবীতে বিভিন্ন আকারের এবং প্রকারের একনায়কত্ব, সমষ্টিতন্ত্রতা (Totalitarian states) এসে দেখা দিয়েছে। যন্ত্রের শক্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে, বিভিন্ন দেশ বা রাষ্ট্রের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল—কয়লা, বিদ্যুৎ এবং পেট্রলের সাহায্যে যন্ত্র সে দূরত্ব ক্রমেই অপসারিত করছে। ফলে, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জীবন-সংগ্রাম ক্রমেই উৎকট থেকে উৎকটতর মূর্ত্তি ধারণ করছে।

ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, এখন ব্যাপক এবং গভীর আন্তরিক বন্ধন ছাড়া কোন একটা রাষ্ট্রের পক্ষে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা কিম্বা আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের এই সব প্রয়োজন পূরণ করবার জন্য দরকার (১) ব্যষ্টির মধ্যে গভীর আত্মীয়তাবোধ (২) জনসাধারণের মধ্যে প্রেরণা-সঞ্চারী ব্যাপক আদর্শ (৩) নেতৃবর্গের মধ্যে সুমহান দায়িত্বজ্ঞান (৪) কর্ম্মীদের মধ্যে প্রখর কর্ত্তব্যবোধ

প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রয়োজনের এক সঙ্গে এবং সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করা যাক।

জনসাধারণের মধ্যে গভীর আত্মীয়তাবোধ এবং প্রেরণা-সঞ্চারী ব্যাপক একটা আদর্শ না থাকলে, তাদের সম্মিলিত করা যায় না, আর তাদের সাহায্যে কোন বড় জাতীয় কাজ করা যায় না। এই দুইটী জিনিষের অভাবই হ'চ্ছে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। ভারতবাসীদের মধ্যে গভীর আত্মীয়তার বোধ নাই। হিন্দু মুসলমান থেকে নিজকে পৃথক্ বলে মনে করে, মুসলমান হিন্দু থেকে নিজেকে পৃথক্ বলে মনে করে, খৃষ্টান হিন্দু এবং মুসলমান উভয় থেকেই নিজেকে পৃথক বলে মনে করে। এই সব শ্রেণীর মধ্যে নিবিড় আত্মীয়তাবোধ কি ক'রে জাগাতে পারা যায়? সামাজিক আত্মীয়তার বন্ধন বাঞ্ছনীয় হ'লেও, অপরিহার্য্য নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক আত্মীয়তা-বন্ধন না থাকলেও, তারা মোটের উপর নিজেরা এক জাতি বলেই মনে করে। মুসলমানদের বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে তেমন নিবিড় কোন আত্মীয়তার বন্ধন নাই, অথচ তারাও নিজেদের এক জাতি বলেই মনে করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গভীর আত্মীয়তাবোধের জন্য সামাজিক

বন্ধন বাঞ্ছনীয় হ'লেও, অপরিহার্য্য নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে এমন কি বস্তু আছে, যা' এই আত্মীয়তাবোধ জাগিয়ে রেখেছে? আর বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই বা কোন বস্তুটি এই আত্মীয়তাবোধ জাগিয়ে রেখেছে? বলা বাহুল্য, আদর্শের ঐক্যই এ কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।

যে আদর্শবোধ এই দুই সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে ঐক্য এবং আত্মীয়তাবোধ জাগিয়ে রেখেছে, সে হ'চ্ছে ধর্ম্মের আদর্শ। এখন আমরা চাই ব্যাপকতর, দৃঢ়তর অথচ উন্নতিশীলতার পরিপোষক যুগোপযোগী এক আদর্শ, যার সাহায্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর এবং জাতির লোকেরা নিজেদের পরস্পরের আত্মীয় বলে মনে করতে পারে। সে কাজ একমাত্র জাতীয়তার আদর্শই সুসম্পন্ন করতে পারে। এ আদর্শ যে বিভিন্ন জাতির এবং সম্প্রদায়ের লোককে এক ক'রে দিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত রাশিয়া, চীন, জাপান, কেনেডা, সাউথ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়।

এই একীকরণের ব্যাপারে ধর্ম্মমূলক আদর্শ জাতীয়তার আদর্শের কাছে হার মেনেছে বলেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র এখন ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠিত হ'চ্ছে; ধর্ম্মাদর্শের প্রধান দুর্ব্বলতা এই যে, তার স্বাভাবিক গতি হ'চ্ছে বিভক্তির দিকে, বিচ্ছেদের দিকে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস পড়লেই দেখতে পাওয়া যায়, অতি অল্পকালের মধ্যে কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে দেখা দেয়। ধর্ম্মের কলহ এক নিদারুণ ব্যাপার। কেননা, কার মত ঠিক, আর কার মত ঠিক নয়, এই নির্দ্ধারণ করবার কোন উপায় ধর্ম্ম-দর্শন বা ধর্ম্ম-বিজ্ঞান এখন পর্য্যন্ত উপস্থিত করতে পারেনি; আর কখনও পারবে বলে মনে হয় না। তারপর সম্প্রদায় সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ, খাওয়া-পরা,

পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা প্রভৃতির ব্যাপারেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ এসে প্রবেশ ক'রে জাতিকে পরস্পরবিরোধী বিভাগে বিভক্ত ক'রে ফেলে। বৈষ্ণব এবং শাক্ত, সিয়া এবং সুন্নী, ক্যাথোলিক এবং প্রোটেষ্টাণ্ট, এইভাবে পরস্পরবিরোধী মতবাদে সমাজ বিভক্ত হয়েছে। তারপর ধর্ম্ম-মূলক সমাজের স্বাভাবিক প্রবণতা (tendency) হ'চ্ছে সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দেওয়া। ধর্ম্মাদর্শের এই দুর্ব্বলতার ফলে এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সব যায়গায় জাতীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কাছে জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। এখন সব সভ্য দেশেই ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে জাতীয়তাকেই রাষ্ট্রের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করা হ'চ্ছে। আমাদেরও তাই করতে হ'বে। আমাদের দেশে যে এ আদর্শ এখন পর্য্যন্ত মিলনের এবং আত্মীয়তার গ্রন্থিকে যথেষ্টরূপে মজবুত ক'রে বাঁধতে পারেনি, তার কারণ আদর্শের দুর্ব্বলতা নয়, তার কারণ হ'চ্ছে আমাদের ঐকান্তিকতার অভাব। ব্যক্তিগত, বংশগত এবং সম্প্রদায়গত স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বিপথে নিয়ে যায়, আর তার ফলে যুগাদর্শের আহ্বান ব্যর্থ হয়। অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে জাতীয় আদর্শের দোহাই দিয়ে আমরা ব্যক্তিগত অথবা বংশগত অথবা সম্প্রদায়গত স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করি। ফলে, আদর্শের দুর্নাম হয়। মোট কথা, আমরা এখনও মধ্যযুগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

আমরা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে বিচার ক'রে দেখি, কোনটা সত্যই জাতীয়তার আদর্শের পরিপোষক আর কোনটা তার পরিপোষক নয়, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে সেই কাজ বা উক্তির সমর্থন করি, যা' প্রকৃতই জাতীয়তার পরিপোষক ; আর সেই কাজ বা উক্তির প্রতিবাদ এবং বিরোধিতা করি, যা' জাতীয় আদর্শের প্রকৃত পরিপোষক নয়, তা' হ'লে

আমাদের আদর্শের সাধনা ব্যর্থ হ'বে না। আমরা যদি সত্যই নিজেদের প্রথমে ভারতবাসী এবং বাঙালী আর তারপর হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত কিম্বা মুসলমান-সম্প্রদায়ভুক্তরূপে ভাবতে শিখি এবং সেই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে কাজ করতে শিখি এবং কথা ও কাজের দ্বারা সে আদর্শকে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত করতে ঐকান্তিকভাবে যত্নবান্ হই, তা'হ'লে অদূর ভবিষ্যতে এই কালোপযোগী আদর্শই ভারতবর্ষে সেই একতা এবং আত্মীয়তাবোধের সৃষ্টি করবে, যার ফলে দেশময় প্রেমের প্রবাহ বইবে এবং বর্ত্তমানের সব অভাব, সব প্রয়োজন পরিপূরিত হ'বে। আকবর এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে একদিন কাজ করেছিলেন, আর তার ফলে ভারতবর্ষে গৌরবময় মোগল-যুগের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছিল। এখন যদি আন্তরিকতার সঙ্গে এই আদর্শের সমর্থনে প্রচার-কার্য্য এবং গঠনমূলক কার্য্য চালান যায়, তা'হ'লে নিশ্চয় অদূর ভবিষ্যতে অনুরূপ ফল পাওয়া যাবে।

এখন তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রয়োজনের এক সঙ্গে আলোচনা করা যাক। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সুমহান্ দায়িত্ববোধের অভাব হ'লে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। আমরা নিত্য চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, নেতৃবর্গের দায়িত্বজ্ঞানের অভাবে বহু মহামূল্য প্রচেষ্টা এবং আদর্শ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'চ্ছে। সার্থকতা যদি সত্যই আমাদের কাম্য হয়, তা' হ'লে নেতৃবর্গের মধ্যে সুমহান্ দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হ'বে; অন্য কথায়, সুমহৎ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নেতৃত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে।

এ কাজ অসম্ভব হ'বে না কর্ম্মীদের মধ্যে যদি প্রখর কর্ত্তব্যবোধ এবং স্বদেশানুরাগ ক্রিয়াশীল হয়। নেতারা তা'হ'লে দায়িত্বজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হ'তে বাধ্য হবেন। কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মিবৃন্দ যদি

দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নেতৃবর্গের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে জাতীয় ঐক্যের, জাতীয় মঙ্গলের, জাতীয় স্বার্থের এবং জাতীয় আদর্শের বাণী দেশময় প্রচার করতে থাকেন, এবং একমাত্র সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে যদি গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তা'হ'লে কোন বিরুদ্ধ শক্তিই তাদের প্রতিরোধ করতে পারবে না। ভারতবর্ষের, তথা বাংলার ভাগ্য তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হ'বে।

এই নূতন বাণীর প্রচারক কবি, মনীষী ও সাহিত্যিকদেরই হ'তে হ'বে। সব দেশেই এঁরাই নূতন যুগের, নূতন আদর্শের প্রচারকার্য্য চালিয়েছেন। আমাদের দেশের সাহিত্যিকদেরও সে কাজ করতে হ'বে। এ কাজে যদি তাঁরা একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করেন, তা' হ'লে তাঁদের লেখায় নূতন তেজ, নূতন প্রাণ, নূতন শক্তি দেখা দেবে। নিজেদের সাফল্যে তাঁরা নিজেরাই চমৎকৃত হবেন।

আমি যে গঠনমূলক কার্য্যের প্রস্তাব করছি, সে কাজ কেবল সাহিত্যিক অথবা রাজনৈতিক অথবা বিশেষ বিশেষ সঙ্ঘভুক্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না। দেশের প্রত্যেক পুরুষ এবং প্রত্যেক নারীকে সে কাজ করতে হ'বে। প্রত্যেকের সে কাজ করা উচিত। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের, অপরিণত বয়স্ক বালক-বালিকাদেরও সে কাজ করা উচিত। সে কাজ কেবল বক্তৃতার সাহায্যে কিম্বা লেখার সাহায্যে কিম্বা সুগঠিত প্রতিষ্ঠানাদির সাহায্যে করলে চলবে না; প্রত্যেক ভারতবাসীকে, প্রত্যেক বাঙালীকে নিজ নিজ সুযোগ এবং সুবিধামত কাজ করতে হ'বে। সে কাজের জন্য একমাত্র অপরিহার্য্য প্রয়োজন হ'চ্ছে উদার দৃষ্টি এবং পরিশুদ্ধ অন্তরের। প্রত্যেককে দেশের সেবার জন্য, দশের সেবার জন্য শুদ্ধ মনে, স্থির সঙ্কল্প নিয়ে দিনের কাজ আরম্ভ করতে হ'বে, আর দিনের শেষে অন্তরের খাতা খুলে দেখতে হ'বে, সেদিন সে

দেশের জন্য, দশের জন্য, দেশের হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-নাস্তিক-উচ্চ-নীচ সকল মানুষের জন্য কিছু করেছে কি না। যদি ক'রে থাকে, তা'হ'লে, পরদিন আর কিছু বেশী ক'রে করবার সঙ্কল্প তাকে করতে হ'বে; আর যদি সে কিছু না ক'রে থাকে, তা'হ'লে নিজের জীবনকে ধিক্কার দিয়ে, করুণাময়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে পরদিনের সেবার এবং সাধনার জন্য অটুট সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হ'বে। এভাবে যে কাজ করবে, সেবার এবং সাধনার সহজ, সুন্দর ও ফলপ্রসূ পথ অনায়াসে সে দেখতে পাবে। সেবা এবং সাধনার সাফল্যে জীবন তার সার্থক হ'বে, ভরাট হ'য়ে উঠবে।

বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, দেশ কিম্বা জাতি যখন কাম্যতর, উচ্চতর কোন জীবনের জন্য সত্যই প্রস্তুত হয়, তখন কোন ক্ষণজন্মা এক মহাপুরুষ, ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট কোন এক মহা-মানব (man of destiny) জাতির সমস্ত আশা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাধনার মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হ'ন এবং এসবকে ব্যক্ত এবং রূপায়িত ক'রে তোলেন। ধর্ম্মের পরিভাষায় এই সব মহাপুরুষদের অবতার, পয়গম্বর, মেহেদী, মেসাইয়া (Messiah) প্রভৃতি বলা হ'য়ে থাকে। কার্লাইল তাঁর বিখ্যাত 'বীর এবং বীরপূজা' (Hero and Hero-worship) পুস্তকে এই শ্রেণীর মহাপুরুষদের বীর (Hero) আখ্যা দিয়েছেন। আমরা তাঁদের যুগমানব বলব। অশোক, আকবর, জর্জ্জ ওয়াশিংটন, কামাল আতাতুর্ক প্রভৃতি হচ্ছেন এই শ্রেণীর যুগমানব। আমার স্থির বিশ্বাস, ভারতবর্ষ যখন জাতীয়তার আদর্শের জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হ'বে, তখন এই শ্রেণীর এক যুগমানব এ দেশে আবির্ভূত হবেন আর জাতীয়তার আদর্শকে ফলে ফুলে সুশোভিত ক'রে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই প্রাচীন দেশের ইতিহাসে গৌরবময়

এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হ'বে। ভারতবর্ষে, বিশেষ ক'রে বাংলায় যুগে যুগে বিচিত্র ভাবের বন্যা এসেছে, বহু জাতির সংমিশ্রণ হয়েছে। তাদের পারস্পরিক মেলা-মিশায় এবং শিক্ষা, সভ্যতা ও মতের আদান-প্রদানে এখানকার মহাভাবের গঙ্গোত্রীধারা পুষ্টই হয়েছে। ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেবে। পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ আমাদের এই সুবর্ণপ্রসূ ভারতভূমি সত্যই মহামানবের তীর্থভূমি। এই মহামিলনের পটভূমি যে বাংলাদেশে রচিত হ'চ্ছে, এ আমি অন্তরচক্ষে যেন দেখতে পাচ্ছি; আর লক্ষ্য করছি সেই অনাগত কালোপযোগী যুগমানবের আবির্ভাব। সে যুগমানব কবে আবির্ভূত হবেন, বলতে পারি না। তবে তিনি কি ভাবের মানুষ হবেন, সে বিষয়ে আমার মনে যে ধারণা আছে, তাই এখানে উপস্থিত করছি।

সেই অনাগত মহামানব একান্তভাবে সত্যনিষ্ঠ, সত্যভাষী এবং সত্যদর্শী হবেন। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি প্রভৃতি তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করবেন। দুঃখীর দুঃখে, শোকাতুরের শোকে, ব্যথিতের ক্রন্দনে অন্তর তাঁর বিগলিত হ'বে। ন্যায় এবং সুবিচারের প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তরে তাঁর সর্ব্বদাই তুমুল এক হিল্লোল চলবে। অন্যায় এবং অত্যাচার মোটেই তিনি সহ্য করতে পারবেন না। জাতীয়তার তিনি মূর্ত্ত প্রতীক হবেন, জাতীয়তার বাণী সর্ব্বদাই তাঁর মুখে শোনা যাবে। একান্তভাবে ন্যায়নিষ্ঠ এবং ধর্ম্মপ্রাণ হ'লেও, ধর্ম্মশাস্ত্র নিয়ে তিনি বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না; কেননা, তিনি হবেন বিশিষ্ট ধর্ম্মনিরপেক্ষ মহান্ এক আদর্শের মূর্ত্ত প্রতীক—ধর্ম্মের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হবে সম্রাট আকবরেরই মত। আকবরের মতই তিনিও বলবেন:

"তোমার যারা প্রিয়, তারা সনাতনপন্থীও নয় আর নব্যপন্থীও নয়!
উভয় দলই সত্যের অনাবৃত রূপ থেকে দূরে পড়ে আছে!

নব্যপন্থী তার নূতন পন্থা নিয়ে ব্যস্ত, আর সনাতনপন্থী তার পুরাতন পন্থা নিয়ে ব্যস্ত! গোলাপের মধুর পরাগ কিন্তু তার অন্তরেই পাবে, যে আতরের কারবার নিয়ে ব্যস্ত!"

অনাগত এই মহামানব কোন শাস্ত্রবাক্যের সাহায্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবেন না। যিশুখৃষ্টের মত তিনিও বলবেন ঃ

"Follow me, for I am the light, I am the law and the commandment—"

নব্য জাতীয় জীবনের তিনিই হবেন মূর্ত্ত বিগ্রহ, তাঁর প্রতিষ্ঠার তিনিই হ'বেন শ্রেষ্ঠ দলিল।

চরিত্রে, জ্ঞানে এবং বিভূতিতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের মত হ'লেও, নিজেকে তিনি অবতার অথবা পায়গম্বররূপে প্রচার করবেন না। সেভাবে কেউ যদি তাঁকে প্রচার করতে যায়, তিনি তাতে বাধা দেবেন। যেহেতু নূতন এক ধর্ম্মমত বিরোধেরই স্থষ্টি করবে, মিলনের স্থষ্টি করবে না। তিনি হবেন মিলনের মূর্ত্ত প্রতীক। তিনি যদি মুসলমানের ঘরে জন্মান তা'হ'লে হিন্দু ঘেষা হবেন; আর যদি হিন্দুর ঘরে জন্মান, তা'হ'লে মুসলমান ঘেষা হবেন। হিন্দু তাঁকে হিন্দু ব'লে মনে করবে, আর মুসলমান তাঁকে মুসলমান বলে মনে করবে। তাঁর মুখের, মনের এবং অন্তরের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য এবং বিভূতি সর্ব্বশ্রেণীর এবং সর্ব্বজাতির মানুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করবে। তাঁর অন্তরের করুণা, তাঁর মনের ঐশ্বর্য্য, তাঁর চরিত্রের বলবীর্য্য তাঁর মুখমণ্ডলে, তাঁর সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হ'বে। তিনি হিন্দুর কথাও ভুলবেন না, আর মুসলমানের কথাও ভুলবেন না—বাঙালীর কথাও ভুলবেন না, আর পাঞ্জাবীর কথাও ভুলবেন না; উচ্চের কথাও ভুলবেন না, আর নীচের কথাও ভুলবেন না। সকলকেই তিনি ভালবাসবেন, আর সকলেই তাঁর কাছে সুবিচার, শান্তি ও সান্ত্বনা পাবে।

অন্তর্য্যামীর নির্দ্দেশ তাঁর কথায়, তাঁর কার্য্যে দেখা দেবে; করুণা-ময়ের সাহায্য তাঁর সাধনাকে, তাঁর বাসনাকে সার্থকতার পথে নিয়ে

যাবে। তিনি যে ভারতের নব্যজীবনের স্রষ্টা, এ বিশ্বাস অটল, অচল ভাবে তাঁর অন্তরে বিরাজ করবে, আর এ বিশ্বাস তাঁকে অমিত তেজ, অমিত পরাক্রম, অমিত শক্তি দান করবে। সূর্য্যের গৌরবে তিনি সার্থকতার পথে অগ্রসর হবেন।

ঘুমন্ত রাজকুমারীর নিদ্রাভঙ্গের মতই ভারতবর্ষ এই ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট যুগ-মানবরূপ রাজকুমারের স্নেহ-পরশে আবার জেগে উঠবে, আর সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠবে ভারতবর্ষের বৃদ্ধ, যুবক, তরুণ, বৃদ্ধা, যুবতী, তরুণী সকলেই! বাংলার বুকে এই অনাগত যুগমানবের আবির্ভাব-সম্ভাব্যকে সার্থক ক'রে জাতির সর্ব্বতোমুখী ও সার্ব্বাঙ্গীন পুনর্জ্জাগরণ যাতে আনতে পারি, সে জন্য আমরা বাঙালী যেন আজ থেকেই ভাবে ও কর্ম্মে কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত হই—অদূরাগত ঐ স্বর্ণযুগের আগমনী-গানে আমরা যেন এই মুহূর্ত্ত থেকেই মুখর হই; নিশ্চল অনড় অতীত সংস্কার যেন আমাদের পথরোধ না করে। যুগে যুগে সত্য ও সংস্কার নব নব' রূপ পরিগ্রহ ক'রে থাকে, এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার ক'রে আমরা যেন আর আত্মবঞ্চনা না করি। বাংলার শ্যামল বুকে যারা লালিত-পালিত, এখানকার সুনির্ম্মল আলো-হাওয়ায় যারা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট, এখানকার মাটির রসে যাদের প্রাণ সঞ্জীবিত, বাংলার গিরি-নদী-প্রান্তর-পথ যাদের হিয়ায় পুলক-শিহরণ তুলে এবং বাংলা ভাষায় যারা প্রথম বর্ণোচ্চারণ করে ও মনের ভাব প্রকাশ করে—জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে তাদের ঠাঁই বাঙালীর নব্য জাতীয়তার প্রশস্ত আঙ্গিনায় অসঙ্কুলান হ'বে না। বাঙালী হিন্দু, বাঙালী মুসলমান, বাংলার সব ভাই-বোনের সম্মিলিত চিত্তে এই অখণ্ড জাতীয়তার অভিনব শুভ প্রেরণা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠুক, এই প্রার্থনা।

সমাপ্ত